রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

রূপ ও রস

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

রূপ ও রস

(সাহিত্যিকা—দ্বিতীয় পর্য্যায়)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আর্য্য পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা
১৩৩৫

প্রকাশক—

শ্রীরতিকান্ত নাগ

আর্য্য পাবলিশিং হাউস

প্রথম সংস্করণ

মাঘ, ১৩৩৫

দাম দেড় টাকা]
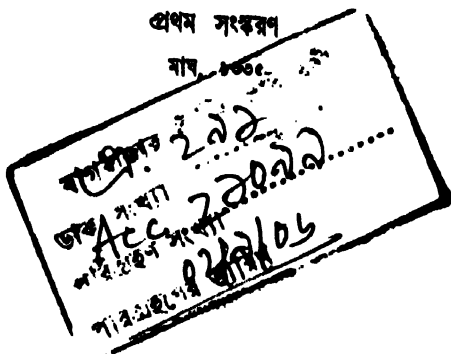
মুদ্রাকর—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাণী প্রেস

৩৩ এ মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা

সূচীপত্র

রূপ ও রস

কাব্য-পুরুষ

কবিতা তৈয়ার করিবার জিনিষ নয়, কবিতাকে করিতে হয় স্বষ্টি ; কবিতাকে গড়া যায় না, কবিতাকে দিতে হয় জন্ম। কেবল উপকরণগুলি অধ্যবসায় সহকারে জোগাড় করিয়া চতুরতার সাথে সাজাইয়া গুছাইয়া ধরিতে পারিলেই যে শিল্পী হইয়া উঠা যায়, তাহা নয়। বৈজ্ঞানিক এখান হইতে হাইড্রোজেন লইতেছেন, ওখান হইতে অক্সিজেন লইতেছেন, আর এক স্থান হইতে তাড়িত প্রবাহ আনিয়া উভয়ের মধ্যে চালাইয়া দিতেছেন—তৈয়ার করিতেছেন জল ; কিন্তু তিনি রূপকার নহেন। সেই রকম কথা গাঁথিয়া গাঁথিয়া, বিচারপূর্ব্বক অর্থসঙ্গতি ঠিক রাখিয়া, তাহাতে হৃদয়াবেগের রঙ্‌ চড়াইয়া দিলেই ফলে যে জিনিষটি হয় তাহাকে কবিতা নাম দেওয়া যায় না। কবি কবিতাকে উৎপাদন করেন, পিতা যেমন সন্তানকে উৎপাদন করেন—আপনার অন্তরাত্মা হইতে, নিজের

সার পদার্থ দিয়া, নিজের অখণ্ড সত্তা দিয়া। আত্মা বৈ জায়তে —শারীর-পুত্রও বটে, আর মানস-পুত্র কবিতাও বটে। পিতার ঔরসে সন্তানের জন্ম; তেমনি কবির কবিত্ব-তেজে কবিতার জন্ম। অর্থাৎ কবিতা জড়পদার্থ নয়, আমার ইচ্ছাধীন কোন যন্ত্রগত (mechanical) প্রক্রিয়ায় উহাকে পাই না ; কবিতা সজীব পুরুষ, উহার আছে নিজের একটা পূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

রক্তমাংসের যে পুরুষ-বিশেষ তাহাকে বলি মানুষ ; এই মানুষই যখন আপনার সমস্ত সত্তা বাক্যে রূপান্তরিত করিয়া ধরে তখনই হয় কাব্য। কাব্য হইতেছে বাঙ্ময় পুরুষ। সুতরাং যখন মানুষের বাঙ্ময় প্রতিরূপ হইতেছে কবিতা, তখন গোটা মানুষের পরিচয় যাহাতে, কবিতারও পরিচয় তাহাতে। মানুষের স্বভাব ও স্বরূপ প্রতিফলিত মূর্ত্ত কবিতার স্বভাবে ও স্বরূপে। চারিটি জিনিষ লইয়া গোটা মানুষ—দেহ, প্রাণ, মন ও আত্মা। দেহ হইতেছে এই স্থূল শরীর—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্থি মেদ মাংস—এই সব জড় উপকরণ। প্রাণ হইতেছে জীবনীশক্তি —সেই শক্তির প্রবাহ, যাহা দেহের মধ্যে বহিয়া চলিয়াছে, জড়কে সজীব করিয়া, নানা খণ্ড খণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সামঞ্জস্যে সাজাইয়া সচল করিয়া তুলিয়াছে। মন চিন্তারূপে, জ্ঞানরূপে জীবনীশক্তির চক্ষু হইয়া উহাকে দেখাইয়া দিতেছে পথ, ফুটাইয়া জাগাইয়া ধরিতেছে উহার অভিব্যঞ্জনা, উহার লক্ষ্য, উহার উদ্দেশ্য। আর আত্মা হইতেছে অতি-অন্তরের সেই অদৃশ্য বস্তু, যাহা সমস্তের কেন্দ্র ঐক্যসূত্র, যাহাকে ধরিয়া ঘিরিয়া আছে, যাহার জন্যই আছে দেহ

প্রাণ মন ; ইহা সেই নিগূঢ় সত্তা, যাহার নিবিড় চেতনা ও প্রেরণাকে প্রকট করাই, স্ফুট করাই দেহের, প্রাণের, মনের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মানুষের মত, মানুষের অভিব্যক্তি যে কবিতা তাহারও আছে এই চারিটি অঙ্গ। কবিতার দেহ হইতেছে বাক্য বা কথা, প্রাণ হইতেছে ছন্দ, মন হইতেছে অর্থ আর আত্মা হইতেছে ভাব। বাক্য কথা শব্দ কবিতার প্রতিষ্ঠা, কবিতার বাহ্য অবয়ব, গড়িবার দ্রব্যসম্ভার। কিন্তু বাক্য কথা শব্দ সবই জড় ; ছন্দেরই আবেগ উহা-দিগকে সজীব সচল সরাগ করিয়া তুলিয়াছে, উহাদের মধ্যে দিয়াছে জীবন্ত সামঞ্জস্য, ঐক্য। আবার কেবল কথা ও ছন্দ থাকিলেই কবিতা হয় না - কথার থাকা চাই বিশেষ অর্থ, ছন্দের পারা চাই সেই অর্থকে ব্যঞ্জিত, রঞ্জিত করিয়া ধরা। কথা জড়, ছন্দ অন্ধ—অর্থ ই হইতেছে কবিতার মনশ্চক্ষু। আর ভাব হইতেছে অর্থেরও পিছনে রহিয়াছে যে মূল বোধ অনুভব বা বীজ উপলব্ধি। ইহাই কবিতার আত্মা। ভাবের সংজ্ঞা আলঙ্কারিকেরা দিয়াছেন এই :—

নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া

অথবা,

নির্ব্বিকারে মনসি উদ্বুদ্ধমাত্রো বিকারো ভাবঃ।

যে চিত্তে কোন আবেগের সাড়া এখনও পড়ে নাই, যে মানসে চিন্তার ঢেউ এখনও খেলে নাই, সেখানে সর্ব্বপ্রথম যে সাড়া, যে ঢেউ, যে চাঞ্চল্য, যে রকমে দেখা দেয় তাহারই নাম 'ভাব'। চিত্ত বা মন না বলিয়া, উপরের দিক হইতে দেখিলে আমরা

বলিতে পারি, নির্ব্বিকার আত্মায় যে প্রথম বিকার তাহাই 'ভাব'। আত্মা আদিতঃ ও মূলতঃ হইতেছে স্থির, নির্গুণ, অবিকার—অক্ষর পুরুষ বা ব্রহ্ম; সৃষ্টির প্রাক্কালে সেখানে উপস্থিত হয় একটা বিক্ষোভ, গুণের আবেশ, একটা স্ফুট চেতনা, একটা মুখর আনন্দ, একটা জাগ্রত ইচ্ছা—শক্তির এই প্রথম আবির্ভাব কবির মধ্যে 'ভাব', অন্তর্য্যামী পুরুষের লীলার আদি ঈষণা, চিন্ময় প্রেরণা, রসোপলব্ধি। ভাবের মধ্যে নিহিত আছে একটা বিশেষ সত্যের রসস্বরূপ—একটা আনন্দ-ঘন উপলব্ধির মূল অবয়ব, সূক্ষ্ম সত্তা, বা তুরীয় কি দিব্য শরীর (প্লেতোর 'আইডিয়া'র সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে)।

সুন্দরের সহিত, সত্যের সহিত কবির যে প্রথম সাক্ষাৎ, যে পূর্ব্বরাগ তাহারই নাম ভাব। তাই ভাব হইতেছে কবিতার স্বরূপ, কবিতার উৎস—এইখান হইতেই কবিতার আরম্ভ। কিন্তু ভাব আত্মার জিনিষ, সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত, বাক্যের মনের অগোচর; ভাব যখন গোচর হইয়া দেখা দিয়াছে তখন তাহাতে ফুটিয়াছে অর্থ; অর্থ হইতেছে মনবুদ্ধির মধ্যে ভাবের অবতরণ, মস্তিষ্কের পটে তাহার প্রকাশ বা প্রতিচ্ছবি; অর্থ ভাবকে "বুঝাইয়া" দিতেছে, শুধু যাহা সৎ বা অস্তি তাহার 'কি' ও 'কেমন' স্পষ্ট করিয়া স্ফুট করিয়া ধরিতেছে—মন-বুদ্ধির জ্ঞান যেমন আত্মাকে বিবৃত করিয়া বিশদ ব্যাখ্যা দিয়া ধরিতেছে। তারপর ভাবের আছে শক্তি, বেগ, স্পন্দন, দোলন। গতির আবেগে ভাব যখন উৎসারিত হইয়া চলে, ঢেউ দিয়া পড়ে গিয়া প্রাণের তটে,

প্রাণ তখন বাজিয়া ফুলিয়া উঠে ছন্দের তালে ও সুরে। ভাবকে আমরা কবিতার উৎস বলিয়াছি; ভাব যদি হয় উৎস, তবে ছন্দ হইতেছে স্রোত, আর সেই স্রোতে খেলিতেছে যে আলোর সম্পাত তাহাই অর্থ। ভাব যেন আত্মগত আত্মরত প্রজ্ঞাঘন সমাধিস্থ সত্তা, অর্থ যেন ব্যুত্থানের পথে সেই সত্তার বহির্মুখী চেতনা ও জ্ঞান, আর ছন্দ তাহার অনন্দময় তপঃশক্তি—ছন্দই ভাবকে বাহিরে টানিয়া জাগ্রতের প্রকাশের দিকে চালাইয়া লইয়াছে—উপনিষদের কথায়, প্রাণশক্তি যখন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে, তখনই সকল বস্তু ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া ধরা দিতে থাকে, যাহা হিরণ্যগর্ভ তাহা বিরাট্ হইতে চলে। কিন্তু তারপর ছন্দের চাই একটা আশ্রয়, অর্থের চাই একটা বাহন; ছন্দকে অর্থকে শরীরী করিয়া ধরিতে, স্থূলে বাঁধিয়া রাখিতে প্রয়োজন একটা রূপ বা আধার, তাই বাক্যের উদ্ভব। ভাবের যে স্থির-সত্তা স্থূলে তাহারই প্রতিকৃতি হইতেছে বাক্। ব্রহ্ম নামিয়া আসিতে আসিতে যেমন অন্নে পরিণত হইয়াছে, আত্মা যেমন শরীরের সীমায় আসিয়া বাঁধা পড়িয়াছে, সমস্ত সৃষ্টি যেমন জড়ে মূর্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই রকম ভাব বাক্-এর মধ্যে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে—বাক্-এর মধ্যেই কবিতা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক সীমানায় ভাব হইতেছে উৎস, আর-এক সীমানায় বাক্ হইতেছে প্রতিষ্ঠা—এক দিক হইতে দেখিলে, কবিতা হইতেছে সেই বস্তু, যেখানে একটি বিশেষ ভাব পাইয়াছে তাহার অর্থ, তাহার ছন্দ ও তাহার বাক্; অন্য দিক হইতে দেখিলে,

কবিতা হইতেছে সেই বস্তু—যেখানে একটি বিশেষ বাক্ পাইয়াছে তাহার ছন্দ, তাহার অর্থ ও তাহার নিভৃত ভাব।

কবিতার এই যে অঙ্গ বা কোষ-চতুষ্টয়ের কথা আমরা বলিলাম, —আদর্শ কবিতায় হয়ত তাহাদের সমান উৎকর্ষ ও সমন্বয় হওয়া উচিত (বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ মানুষের মত); কিন্তু বাস্তবে দেখি, শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যেও উহাদের এক একটি শুধু প্রাধান্য পাইয়াছে —একটি দিয়াছে মূল সুর, অন্যান্য কয়টি তাহার অনুগত হইয়া চলিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে হয়ত বা ন্যূনাধিক পরিমাণ অপ্রকাশই রহিয়া গিয়াছে। এই রকমে চারিটি অঙ্গের এক একটিকে ধরিয়া কাব্য-জগতে দেখা দিয়াছে চারিটি ধারা—চারিটি শ্রেণী বা বর্ণ।

আমরা নীচের দিক হইতে আরম্ভ করিব। প্রথম যেখানে বাক্যের কথার বা শব্দের প্রাধান্য—ইংরাজীতে এই শ্রেণীর কবিতাকে বলা হয় Rhetorical poetry, আমাদের আলঙ্কারিকেরা ইহাকে বলিয়াছেন "গৌড়ী রীতি" এবং এই রীতি যাঁহারা অনুসরণ করেন তাঁহাদের নাম দিয়াছেন "শব্দ-কবি"। শব্দের ঝঙ্কার বাক্‌চাতুর্য্য অলঙ্কার অনুপ্রাস প্রভৃতি লইয়া এই ধরণের কবিতার বিশেষত্ব। সংস্কৃতে জয়দেব ইহার হয়ত পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন; বঙ্গ-সাহিত্যে প্রাচীনতর যুগে বিদ্যাপতি, তারপর ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, আধুনিক যুগে সত্যেন্দ্রনাথ ও বিশেষভাবে নজরুল ইসলাম, এই ধারায় পারদর্শী। শুধু কথার ঘটা লইয়া যে কবিতা তাহা কবিতার বাহ্যতম অঙ্গেরই উপর জোর দিয়াছে, কবিতার যাহা শরীর তাহারই সেবা ও প্রসাধন করিয়াছে—কবিতার ভিতরকার

অন্যান্য দিক কোথাও থাকিলেও সেখানে গৌণ হইয়া পড়িয়াছে —তাই এই শ্রেণীকে আমরা বলিব কাব্য সমাজের অধমতর বা শূদ্রবর্ণ। কবি এখানে বড় জোর হইতেছেন চতুর কারীগর, কুশলী মিস্ত্রী—অথবা জড় বস্তু লইয়া ভেল্কি খেলেন বলিয়া শিল্পীর নাম এখানে দিতে পারি বৈজ্ঞানিক্‌।

কবি যখন আর এক ধাপ উপরে উঠিয়াছেন, এক পর্দ্দা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি যখন দেহ ছাড়িয়া প্রাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন অর্থাৎ ছন্দের মাধুর্য্যকে ছন্দঃগত ব্যঞ্জনাকে যেখানে কবি সর্ব্বপ্রধান করিয়া তুলিয়াছেন, সেখানে সৃষ্ট হইয়াছে যে ধরণের কবিতা তাহাই হইতেছে সুবিখ্যাত "রোমান্টিক" বা রাগাত্মক কবিতা। এই শ্রেণীর কবিকেই বলা যাইতে পারে রস-কবি। কারণ, প্রাণ হইতেছে অনুভবের, অনুরাগের, আবেগের ক্ষেত্র। প্রাণেরই আছে একটা রঙ্গিণী বৃত্তি, একটা রস-লিপ্সা—যাহা জিনিষকে রঙ্গাইয়া ধরে, সৃষ্টি করে সম্ভোগের জন্য। আর প্রাণের যে ছাঁদ, তাহারই নাম ছন্দ। ছন্দে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে প্রাণের আনন্দের বিচিত্র লাস্য! তাই দেখি রোমান্টিক কবি তাঁহার প্রাণাবেগ, তাঁহার রসবৈদগ্ধ্যকে প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষভাবে ছন্দেই আকৃষ্ট হইয়াছেন—ছন্দের বৈচিত্র্য, ছন্দের মনোহারিত্ব, ছন্দের ক্ষমতা তাঁহার সৃষ্টিতে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে আর কোথাও তেমন হয় নাই! ইউরোপের রোমান্টিক কবি শেলি বা হিউগো—আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ তাই হইতেছেন ছন্দের রাজা। প্রাণকে ছন্দকে আশ্রয় করিয়া শিল্পী

হইতেছেন ঐন্দ্রজালিক ; কারণ, এখানে তিনি জড়ের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, শব্দের মধ্যে রসের ধারা বহাইয়া দিয়াছেন। এই দ্বিতীয় স্তরের কবি-সম্প্রদায়কে আমরা বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি ; কারণ, বৈশ্যের ধর্ম্ম হইতেছে জীবনের জন্য, ভোগের জন্য বস্তু সৃষ্টি করা, বস্তু সরবরাহ করা।

তারপর তৃতীয় পর্দ্দায় কবি প্রাণকে ছাড়িয়া মস্তিষ্কে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তখন তাঁহার সাধনা ও উদ্দেশ্য হইতেছে কবিতাকে অর্থগম্ভীর করিয়া তোলা—ফলে আমরা পাই "ক্লাসিকাল" বা অর্থাত্মক কবিতা। বাক্য এবং ছন্দ এখানে গৌণ আশ্রয়, মুখ্য হইতেছে স্পষ্ট চিন্তাকে বিশেষ অর্থকে প্রকট করিয়া ধরা—বিষয়, বক্তব্য, বস্তু-নির্দ্দেশ এখানে এত প্রধান যে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই শ্রেণীর কবিতাকে আমরা কাব্য-জগতের ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিতে পারি, কারণ, অর্থগৌরব, চিন্তাভার এখানে আনিয়া দিয়াছে ক্ষত্রোচিত একটা সংহত সামর্থ্য, একটা পৌরুষ, স্থৈর্য্য, দার্ঢ্য। ব্রাউনিং, গ্যেটে, সফোক্লা মহাভারতকার বেদব্যাস এই শ্রেণীর ধুরন্ধর। শিল্পী এখানে হইতেছেন দার্শনিক।

চতুর্থ বা তুরীয় স্তরে কবি চলিয়া গিয়াছেন অবাঙ্মনস-গোচর এক ভূমিতে, ভাবের লোকে, আত্মার স্বরূপে। ভাবকে যে কবি মুখ্য করিয়া লইয়াছেন, তিনি চাহিতেছেন অন্তরাত্মার গভীরে সৃষ্টির যে প্রথম ঢেউরেখা তাহাকে আঁকিয়া দেখাইতে, দেহে প্রাণে মনে নামিয়া আসিবার পূর্ব্বে চিন্ময় আকাশে অনুভবের রূপ-রূপ কি রকম তাহার কিছু ইঙ্গিত দিতে। এই শ্রেণীর যে

কবিতা তাহাকে বলা যাইতে পারে ভাবাত্মক বা আত্মিক কবিতা —অন্যত্র ইহারই নাম আমি দিয়াছি কাব্যের "কেল্‌টিক-ধারা।" ইহারই আবার প্রকারান্তর হইতেছে যাহাকে বলা হয় "মিস্‌টিক" কবিতা। ভাবাত্মক কবিতায় একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অর্থ, একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত কিছু সব সময়ে আমাদের বিচারবুদ্ধির আলোতে আসিয়া ধরা দেয় না, ছন্দোবন্ধের চাতুর্য্যে কবি সেখানে আমাদের প্রাণকে চঞ্চল চপল করিয়া তোলেন না, কিম্বা বাক্যের শব্দের সৌন্দর্য্য-সুষমাও সেখানে মুখর প্রগল্‌ভ হইয়া উঠে না; সেখানে যে জিনিষটি সকলের আগে ও প্রধানতঃ আমাদের স্পর্শ করে তাহা হইতেছে একটা অনির্দ্দেশ্য কিছু, সুদূরের গভীরের সম্পর্কের একটা অলৌকিক দৃষ্টি ও অনুভূতি—the devotion to something afar—এই যেমন রবীন্দ্রনাথের—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে' আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা,
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

অথবা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের—

Breaking the silence of the seas
Among the farthest Hebrides—

সাহিত্যিকা—"কবিত্বের ত্রিধারা" শীর্ষক প্রবন্ধ।

এখানে বাক্য ছন্দ অর্থ যতই সুষ্ঠু ও মনোহর হোক না কেন সেদিকে আগে আমরা আকৃষ্ট হই না, আমাদিগকে মোহিত করিয় ফেলে যাহা, তাহা হইতেছে, কীটস্ যাহাকে বলিয়াছেন unhearc melodies—সে জিনিষ মর্ত্ত্যের ভাষায় ছন্দে বা অর্থে সম্যক্ ব্যক্ত করা যায় না। বাক্য ছন্দ অর্থ সবই আশ্রয় অবলম্বন—অনেক সময়ে বাধা মাত্র। জাপানী কবি তাই বোধ হয় এই সকল অবলম্বন—যথাসম্ভব কম করিয়া প্রায় বাতিল করিয়াই দিয়াছেন —তিনি ব্যবহার করিয়াছেন দুই একটা চিহ্ন মাত্র, সেই চিহ্নের সূত্রে আসল কাব্য-বোদ্ধা রসিক নিজের অনুভবের মধ্যে নিজেই রচিয়া লইবেন, কবি দেউড়ির দুয়ারী মাত্র। ভাবাত্মক কবিতার রস গ্রহণ করিতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে মৌন অন্তর্মুখীনতা—ধ্যানের একতানতা অথবা সমাধির বস্তুমাত্র নির্ভাস। শিল্পী এই স্তরে আসিয়া হইয়াছেন ঋষি—কারণ কাব্যের তিনি ব্রহ্মবাদী,—তিনি সৃষ্টি করিতেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত আছেন তুরীয় দৃষ্টিতে ; এবং সেই জন্যই আবার তিনি বিপ্রবর্ণ।

উত্তরা

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

শ্রুতি ও স্মৃতি

সত্যকে সাক্ষাৎ দেখি যে শক্তির সহায়ে—তাহার নাম দৃষ্টি। আর সত্যকে যিনি দেখেন এই দৃষ্টি দিয়া—তাঁহাকে বলি ঋষি। সত্যের আবার রূপ যেমন আছে তেমনি তাহার আছে একটা নাম। সত্যের সত্তায় যে চিন্ময় শক্তিস্পন্দন সত্যের রূপ আঁকিয়া দিতেছে তাহাই আবার ধ্বনিত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে শব্দের, কথার, মানুষের ভাষার—অর্থাৎ নামের মধ্য দিয়া। সত্যের এই নামই (Numen) হইতেছে মন্ত্র। সত্য-মন্ত্রকে সাক্ষাৎ শুনা হইতেছে শ্রুতি। আর মন্ত্র যাঁহার শ্রুতিতে ধরা দিতেছে তিনিই কবি।

দৃষ্টিতে যে সত্য দেখি, শ্রুতিতে যে সত্য শুনি তাহা যখন পরে আবার মনে করিতে চেষ্টা করি, তাহাকে স্মরণে আনিয়া বুদ্ধি-গোচর করিয়া ধরি, তখন সত্যকে পাই যে রকমে তাহা হইতেছে স্মৃতির কাজ। সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধিকে মনের, তর্কবুদ্ধির,

কল্পনায়, ভাব-বিলাসের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতেছে স্মৃতি। স্মৃতিতে যাহার সত্য আসিয়া প্রতিফলিত হইতেছে তিনি হইতেছেন দার্শনিক—মনীষী।

শ্রুতি নির্ভুল নিঃসন্দেহ অব্যর্থ অব্যভিচারী! শ্রুতি স্বয়ম্প্রকাশ। তাহার প্রমাণ সে নিজে, নৈসর্গিক সত্য-প্রতিষ্ঠার জোরে তাহা অকাট্য অটুট। স্মৃতি সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় দেয় না। স্মৃতি হইতেছে শ্রুতির নীচের স্তরের বৃত্তি। স্মৃতির মর্য্যাদা ততখানিই যতখানি সে শ্রুতির অনুগত হইয়া চলে। যতখানি সে আপন-গড়া পথে চলে ততখানি সে অপ্রামাণ্য, ততখানি তাহাতে শক্তির অভাব, ততখানি সে সন্দেহের বস্তু ও অসম্পূর্ণ। শ্রুতি দিতেছে মনের উপরে, জ্যোতির লোকে সত্যের যে অকুণ্ঠ নির্ঘোষ স্বরূপ। স্মৃতি মনের মধ্যে সেই পূর্ণ জিনিষটি ভাঙ্গিয়া খাট করিয়া বিকৃত করিয়া দিতেছে তাহার একটা দূর-ইঙ্গিত বা প্রতিধ্বনি।

*　　　*　　　*

খাঁটি কবি, মহাকবি, কবিশ্রেষ্ঠ বলি তাঁহাকেই যিনি চলিয়াছেন শ্রুতির প্রেরণায়। যে কবির শ্রুতির সাথে স্মৃতির খাদ যত বেশী মিশিয়া গিয়াছে তিনি তত কম কবি। কবির কবিত্ব শ্রুতির হুবহু অনুলেখনে। আমরা কবি কোলরিজ (Coleridge) এর কথা জানি, তাঁহার কানে এক শ্রুতি বাজিয়া উঠিয়াছিল ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নে; জাগিয়া সে শ্রুতির অতি সামান্য অংশই তিনি লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু স্মৃতি দিয়া সে শ্রুত মন্ত্রকে তিনি ফিরিয়া

তৈয়ারী করিতে চাহেন নাই বা পারেন নাই; বিশুদ্ধ শ্রুতিকেই তিনি অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাই অসম্পূর্ণ হইলেও "কুবলা খাঁ"র মত একটি পরম সুন্দর অনবদ্য কবিতা আমরা পাইয়াছি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) এই হিসাবে বিপথেই চলিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা শ্রুতির জন্য অপেক্ষা করেন নাই—তাঁহার বেশীর ভাগ কবিতাই স্মৃতির সহায়ে রচিত। শ্রুতিকে তিনি যখন পূর্ণভাবে খেলিতে দিয়াছেন, যেন কবিত্বের মহত্ত্বে হয়ত কোলরিজকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্মৃতি আসিয়া যখন শ্রুতির পথরোধ করিয়া ধরিয়াছে তখন তাঁহার কবিতা হইয়া পড়িয়াছে কেবল পদ্য। এই স্মৃতির শক্তি গ্রে'র (Gray) মধ্যে আরও জমাট দেখা দিয়াছে—আসল শ্রুতি কোনদিনই তাঁহার মনের পাষাণচাপ ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারে নাই। তাঁহার

The curfew tolls the knell of parting day

খুব উচ্চস্তরের স্মৃতির শক্তির সৃষ্টি—তাহার পিছনে আছে একটা শ্রুতির চাপা সুর—তাহাতে কারুকার্য্যের, সামর্থ্যের, একটা নিবিড় সান্দ্র অনুভবের পরিচয় আছে কিন্তু নাই সাক্ষাৎ শ্রুতির সহজ সলীল অব্যর্থ জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ। তাই ত—ম্যাথু আর্নল্ডের কথায়—গ্রে কোন দিন মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারিলেন না—could not speak out; আর পোপ (Pope) শ্রুতির দূর প্রতিধ্বনিও পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ; তাঁহার কবিতা নিছক স্মৃতির—নিম্নস্তরের স্মৃতির কবিতা।

* * *

স্মৃতির চর্চা যাঁহার মধ্যে যত বেশী হইয়াছে, শক্তিমান শ্রুতিসম্পন্ন কবি হইলেও তাঁহাতে দেখিতে পাই শ্রুতি কেমন একটা বাধা পাইয়াছে, শ্রুতির সে অনর্গল স্বৈরগতিতে একটা মন্থরতা, একটা কুণ্ঠা আসিয়া পড়িয়াছে। তাই দেখি জগতের আদিকবি যাঁহারা তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহাদের ছিল অন্তরাত্মার একটা উদার প্রসার, হৃদয়ে একটা সরস নবীনতা, অনুভূতিতে একটা সরলতা ঋজুতা—যাহার কল্যাণে তাঁহারা যেন বস্তুর নিবিড়তম সত্যের সৌন্দর্য্যের মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পরে যাঁহারা আসিয়াছেন, মানসবৃত্তি—বুদ্ধিশক্তির দ্বারা যাঁহারা জগতের সহিত পরিচয়টিকে সমৃদ্ধ ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা যেন কাব্য-সৃষ্টির মূল উৎস হইতে একটু দূরেই সরিয়া পড়িয়াছেন। কালিদাস পাণ্ডিত্যের যুগে এক মহাপণ্ডিত ছিলেন। কবি হিসাবেও তিনি মহাকবি। কিন্তু আদিকবি বাল্মীকির স্থান তাঁহারও উপরে। মিল্টনও (Milton) ছিলেন বিদ্বান কবি কিন্তু কবিত্ব শক্তিতে অবিদ্বান সেক্সপীয়রের সমকক্ষ তিনি হইতে পারেন নাই। তাই ভর্জ্জিল হইতেও হোমর গরীয়ান্। সেই একই কারণে গ্যেটে অপেক্ষা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বেশী দূরে উঠিতে পারিয়াছিলেন, কর্ণেই (Corneille) বা রাসীন (Racine)কে ছাড়াইয়া গিয়াছেন মোলিয়ের (Moliere)। এই নিয়মের ব্যতিক্রম বোধ হয় এক দেখাইতে পারিয়াছেন লেয়োনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci)। কিন্তু ব্যভিচারই ত নিয়মের প্রমাণ। পণ্ডিতীযুগের (Classical age)—স্মৃতির যুগের স্থান

চিরকালই শ্রুতির যুগের—Intuitive age-এর—নীচে, শুধু কাল হিসাবে পরে নয়, মূল্য হিসাবেও নীচে।

*　　*　　*

ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া যদি একটা জাতির কথা ধরি, সেখানেও পাই এই নিয়ম। যে জাতি যত স্মৃতি চর্চ্চা করিয়াছে, পরিমার্জ্জিত সুতীক্ষ্ণ সমৃদ্ধ বিচার বুদ্ধি দিয়া সত্যকে ফলাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে, সে জাতির কবিত্ব-প্রতিভা তত লঘু হইয়া পড়িয়াছে। স্মৃতির ধর্ম্ম হইতেছে জিনিষকে মনের গোচর করিয়া সহজে বোধগম্য করিয়া সাধারণের বস্তু করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে স্থাপিত করা। তাই স্মৃতির সৃষ্টির মধ্যে পাই বাহিরের কাঠামে একটা শৃঙ্খলা, সেখানে মিলিতেও পারে কল্পনার একটা বৈদগ্ধ্য, একটা চতুর অনুমানের বিধান, পাই সেখানে হয়ত সত্যাভাস, কিন্তু পাই না সত্যের স্ব-ভাব্-শ্রী। ফরাসীর কাব্য সাহিত্য যে এতখানি লৌকিক ও সামাজিক, এতখানি মাটিঘেঁষা (terreà terre), সে জন্য একদিকে সে যেমন মনোরম প্রাঞ্জল বহুজন-প্রেয় হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনি সে পারে নাই দিতে দূরের তুরীয়ের অজ্ঞেয়ের একটা ঔপনিষদিক জ্ঞান। ইংলণ্ডের কাব্য প্রতিভা ব্যক্তিগত মাটিকে ধরিয়াও সে সর্ব্বদাই ছুটিতে চাহিয়াছে উপরের সমুচ্চের এক রহস্য সন্ধানে, তাই সেখানে মাঝে মাঝে যে অলৌকিক মূর্চ্ছনা শুনিতে পাই তাহার তুলনা ফরাসী কাব্যে কোথাও মিলে কি না সন্দেহ। কেল্টিক ও লাত্তিন মনের এই পার্থক্য। জর্ম্মনীতে যে কোন দিন কবিত্ব প্রতিভা তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিল

না, তাহারও কারণ জর্মনীর পণ্ডিতী বিচার বুদ্ধি, জটিল দার্শনিক ভাব-স্মৃতির জমাট চাপ। প্রাচীন রোম গ্রীসের স্মৃতির দিকটি যত আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল, শ্রুতির দিকটি সম্বন্ধে সে তত স্পর্শালু হইতে পারে নাই, তাই তাসিত (Tacitus) বা লিভি (Livy) সীসেরো (Cicero) বা সেনেকা (Seneca) রোম পাইয়াছে কিন্তু প্লেতো (Plato) বা এস্কিল (Aeschylus) সে হাওয়ায় জন্মে নাই। লুক্রেশ (Lucretius) একটা দূরে কি শ্রুতি শুনিতে পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক দার্শনিক গবেষণার ভাবের তলে সেটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এক ভর্জিল (Virgil) বোধ হয় রোমক প্রতিভার মর্য্যাদা রাখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আসন হোমরের (Homer) সমানে নয়।

* * *

বর্ত্তমান যুগে স্মৃতির একরকম একচ্ছত্র রাজত্ব। জড় বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে মানুষের মন গিয়া পড়িয়াছে একেবারে বাহিরের দিকে, তাহার চেতনার কেন্দ্র নামিয়া পড়িয়াছে মস্তিষ্কের নীচের স্তরে। দূর হইতে ঊর্দ্ধ হইতে কোন অনাহত বাণী তাহার চেতনাকে বৃহতের সুরে আর স্পন্দিত করে না। মগজের মধ্যে আবদ্ধ যে খণ্ড ম্লান আলো, তাহাকে বিনাইয়া বিনাইয়া, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে খচিত করিয়া সে চলিয়াছে। বিচার বিশ্লেষণ, পরীক্ষা, গবেষণা, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা প্রভৃতি জ্ঞানের পরোক্ষবৃত্তি মানুষের মস্তিষ্ককে এমনভাবে অভিভূত করিয়া

ফেলিয়াছে যে, সেখানে অপরোক্ষ উপলব্ধি আর প্রকাশের কোন পথই পাইতেছে না। মানুষ হইয়া পড়িয়াছে আসুরী জ্ঞানের দাস অর্থাৎ যে জ্ঞান চায় জিনিষকে কাটিয়া ছাঁটিয়া জোর জবরদস্তি করিয়া আয়ত্ত করিতে—দেবতার জ্ঞান, যাহা আনে একটা উদার আলো, সুসমঞ্জস একত্ব ও পরম শক্তি লইয়া তাহা আজ মানুষের কাছে সন্দেহের অবিশ্বাসের বস্তু। স্থূল চোখের দেখাই আজ হইতেছে দৃষ্টি, অন্তরাত্মার তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি তাহার লোপ পাইয়াছে। তাই জগতের সাহিত্যে আজ দর্শনের বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রত্নবিদ্যার—ন্যায়শাস্ত্রের, লজিকেরই প্রাধান্য দেখি; কিন্তু যে সব বিদ্যা হইতেছে সৃষ্টিমূলক (creative), অন্তরাত্মার সহজ স্বচ্ছন্দ প্রকাশেই যাহাদের মহত্ব তাহারা পঙ্গু। কাব্যেও আমরা আজ চাহিতেছি মতবাদের প্রচার, সমাজ-সমস্যা লইয়া আলোচনা, বিবিধ কৌতূহলের মীমাংসা। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি শ্রুতিতে যে জ্ঞান আসিয়া ধরা দেয় তাহা বাহিরের বিষয়ের উপর নির্ভর করে না, একরকমে সে বাহিরের বিষয়কে গড়িয়াই চলে। কিন্তু আধুনিক যুগে আমরা বিষয়ের জ্ঞানকেই সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, উহাকেই স্বতঃসিদ্ধ বানাইয়াছি এবং ইহার কষ্টিপাথরে আর আর সত্য আর আর জ্ঞান কষিয়া দেখিতেছি। ইহারই নাম ত Experimental Method বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। মানুষের জ্ঞানের সৃষ্টিতে আমরা আর সহজ সরসতা পাই না, পাই না একটা উদাত্ত উন্নয়ন—অন্তরের রসায়নের পরিবর্ত্তে আমরা ব্যস্ত বাহিরের খোসা লইয়া শুষ্ক

"কচায়নে"। সত্যের অকুণ্ঠ বাণী—মন্ত্র আর শুনিতে পাই না, আমরা চলিয়াছি অনুমানের আলো-আঁধারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া, জ্ঞান আর প্রাণকে মুক্ত করে না, তাহার বন্ধনেরই জাল বিস্তার করে। যাহা সূক্ষ্ম যাহা জটিল ও বিচিত্র—অণোরণীয়ান্—সেখানে মানুষ হয়ত কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছে; কিন্তু ঐটুকুরই মধ্যে সে আপনাদের জড়াইয়া হারাইয়া ফেলিয়াছে—মহতো মহীয়ান্ যাহা তাহার উদার তরঙ্গ ধরিবার কৌশল ও সামর্থ্য সে পায় নাই। স্মৃতির বহুল বিপাকে সে ঘুরিয়া মরিতেছে কিন্তু শ্রুতির সে অমোঘ স্বস্তি—Unum necessarium—তাহার অধিকারে আসে নাই।

* * *

শ্রুতির এক অন্তরায় হইতেছে মস্তিষ্কের বাদ বিচার—বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি। দার্শনিকতা একরকম স্মৃতি। কিন্তু আর এক রকম স্মৃতি হইতেছে চিত্তের ভাববিলাস, ইহাও শ্রুতির অন্তরায়। ফলতঃ শুষ্ক তর্কবৃত্তি আর তরল ভাবাতিশয্য—এ দুটি মানুষের আধারে যুগপৎ চলিয়া থাকে (parallel movements), উভয়ের মধ্যে আছে একটা নিবিড় যোগাযোগ। যাহার মধ্যে দেখি বিচার বিতর্ক যত নিরেট ভরাট হইয়া আছে তাহারই মধ্যে পাল্টা হিসাবে তলায় পড়িয়া আছে দেখি একটা অতি তরল চিত্তাবেগ। জর্ম্মনীর কঠিন কঠোর পাণ্ডিত্য (Scholasticism), সেখানেই দেখা দিয়াছে জর্ম্মনীর মেয়েলী ভাবালুতা (German Romanticism). সে যাহা হোক, বাঙ্গালীর কাব্যে যে

শ্রুতির সুর ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ স্মৃতির এই সহজ সুলভ ভাবালুতার কলরোল। তর্কবুদ্ধি, বাদ বিচার বাঙ্গালীর দৃষ্টিকে হয়ত তেমন বাধা দিতেছে না। বাঙ্গালীর বাধা হইতেছে অস্থির চিত্ত, অসমর্থ প্রাণ; অল্প সাড়াতেই, বাহিরের এতটুকু উত্তেজনাতেই সে চিত্ত সে প্রাণ উদ্বেলিত মুখরিত হইয়া উঠে। আবেগকে ধারণ করিয়া, সমাহিত করিয়া শ্রুতির পর্দ্দায় উঠাইয়া ধরিবার ধৈর্য্য তাহার নাই।

* * *

তবে বাঙ্গালীরও শিল্প-সৃষ্টিতে শ্রুতির ছন্দ যে ধরা দিতে আরম্ভ না করিয়াছে তাহা নয়। প্রমাণ তাহার নব্য চিত্র পরিকল্পনা। এখানে বাঙ্গালীর বিশেষত্ব যে ভাবালুতা তাহা কি রকমে ভাবঘন হইয়া রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে! পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও এই দারুণ স্মৃতির যুগে এখানে ওখানে শ্রুতির বাণী জোর করিয়া আসিয়া পৌঁছিতেছে। আয়র্লণ্ডের নূতন জাগরণের কাব্য সৃষ্টিতে একটা বহু পুরাতন ও সনাতন সুর জাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে—রুশের নব সঙ্গীত রচনায় সেই একই বৈদিক শ্রুতির প্রেরণার ইঙ্গিত পাইতেছি। মানুষের ভবিষ্যতের পক্ষে এ সবই আশার নিদর্শন! স্মৃতির প্রয়োজন ও সার্থকতা যে নাই তাহা নহে। স্মৃতির প্রয়োজন ও সার্থকতা এই যে, চেতনাকে তাহা বহুবিচিত্র করিয়া তোলে, বস্তুর বাহ্যরূপের ঘটে ঘটে ধরিয়া জ্ঞানকে অনুভবকে সে নানা ভঙ্গিমায় ফলাইয়া ধরে। কিন্তু শ্রুতি দিতেছে অন্তরাত্মার উদার ও উন্মুক্ত মূল সত্য, ভাগবত

চেতনায় যে নিভৃত রসলাস্থ, স্থষ্টির যে তত্ত্বাত্মক নিত্যরূপ (typal realities)। শ্রুতির বাহন হইয়াই স্মৃতির সার্থকতা; নতুবা যে স্মৃতি স্বৈরচারী, শ্রুতির মধ্যে যাহার প্রতিষ্ঠা নাই, তাহাতে সত্যও নাই, তাহা মায়িক মাত্র।

শান্তং সুন্দরম্

কবির কথায় প্রতিধ্বনি দিয়া আমি বলিতে চাই না—শান্তই সুন্দর, সুন্দরই শান্ত। আমি শুধু বলিব, সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা যাহা, তাহার মধ্যে অনিবার্য্য উপাদানরূপে রহিয়াছে একটা নিবিড় শান্তি। বিশেষতঃ, আমার বক্তব্য শিল্পসৃষ্টি লইয়া—শিল্পের সৌন্দর্য্য প্রকাশের দিক দিয়া যে-রকমেরই হোক না, তাহার নিভৃত বনিয়াদ সর্ব্বদাই একটা মহাশান্তি। শিল্পের বাহিরের রূপায়ন যত বহুধা বিচিত্রই হোক, তাহাদের সকলের অন্তরের প্রতিষ্ঠা হইতেছে শান্ত রসায়ন। শৃঙ্গারকে রসের আদি বলা হয়, কিন্তু তাহা বস্তু হিসাবে, যে হিসাবে স্থূল শরীর হইতেছে মানব-আধারের আদি আয়তন। ভাবের হিসাবে, অন্তরাত্মার দিক দিয়া, আদি বা প্রথম হইতেছে শান্ত রস। রসের প্রথম ভৌতিক রূপ শৃঙ্গার হইতে পারে, কিন্তু প্রথম তত্ত্বাত্মিক

রূপ হইতেছে শান্ত রস। শৃঙ্গার আদিরস এই হিসাবে, যে, তাহা আদিম বা primitive রস, কিন্তু শান্ত রস হইতেছে মৌলিক বা primary রস। শান্ত রসই মূল রাগ, অন্যান্য রস তাহাকে ধরিয়া তাহার উপর নানা রাগিণীর বিচিত্র গমক খেলাইয়া তুলিয়াছে—সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা পুরুষের উপর ভর করিয়া প্রকৃতি যেমন তাহার বহুভঙ্গিম প্রকাশ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শক্তির অশান্ত সৌন্দর্য্য শিবের শান্ত সমাহিত সৌন্দর্য্য হইতেই বিচ্ছুরিত, লীলায়িত নহে কি ?

প্রাচীন যুগের শিল্পী এই তত্ত্বটি যেমন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন তেমন বোধ হয় আর কেহ করেন নাই। প্রাচীনের সকল শিল্প-স্থষ্টির মধ্যে তাই দেখি কি একটা গভীর শান্তি নিহিত। প্রাচীন শিল্পীরা রচনা করিতে বসিয়াছিলেন অন্তরে এই অটল শান্তি লইয়া—তাঁহাদের কাজে কোথাও ত্বরার লেশমাত্র নাই। তাঁহারা চলিয়াছেন ধীরে-সুস্থে, অনায়াসে, স্থিরপদবিক্ষেপে। "কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী", আর তাঁহারা নিজেরাও যেন "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—এই শ্রদ্ধায় তাঁহারা কাজে অগ্রসর হইয়াছেন। তাই দেখি, তাঁহারা যখন কিছু গড়িতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহাদের হাত দিয়া এক এক মহাভারত, রামায়ণ, ইলিয়দ বাহির হইয়া আসিয়াছে, পিরামিদ বরবদুর কোণারক মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অজরত্ব অমরত্ব যেন তাঁহাদের স্থষ্টির পর্ব্বে পর্ব্বে ধরা দিয়াছে। প্রাচীনের শিল্প এত সুন্দর—সে সৌন্দর্য্যে রহিয়াছে যে এমন বৃহৎ সামর্থ্য, মহত্ত্ব, গরিমা—কারণ, তাহা অন্তরে অন্তরে এত শান্ত।

পক্ষান্তরে আধুনিকের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখনই দেখি কি একটা মত্ততা, চাঞ্চল্য, অশান্তি ইঁহাদের প্রেরণার মধ্যে রহিয়াছে, ইঁহাদের সৃষ্টিকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট করিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে, উদ্বেল উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দিয়াছে। ইঁহাদের সৃষ্টি অল্পপ্রাণ। একটানা কি বৃহৎ কিছু গড়িতে ইঁহাদের ইচ্ছাও হয় না, সাহসেও কুলায় না। সহজেই ইঁহারা শ্রান্ত হইয়া পড়েন, দূরের পথে চলিতে দম থাকে না। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা"—এই রকম একটা আশঙ্কা তাঁহাদের ভাবে ও ভঙ্গীতে, যেন যাহা করিবার যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া দিতে হইবে, বিলম্বে হয়ত কিছু হইবে না,—দৃষ্টিতে তাঁহাদের ব্যগ্রতা, বুকে কম্পন, হাতে অনিশ্চয়তা। সৃষ্টিতে তাঁহাদের তাই দেখি লাগিয়া রহিয়াছে কেমন এক মরণেরই ছাপ।

আধুনিক জগতে যে বিরাট্ বা বিপুল জিনিষ আদৌ সৃষ্টি হয় না তাহা বোধ হয় বলা যায় না। আমেরিকার এক একটি গগনচুম্বী প্রাসাদ (sky scraper) কলেবর হিসাবে পিরামিদ অপেক্ষা ছোট হইবে না। খবরের কাগজের অনেক লেখক যত কথা আজ অনর্গল লিখিয়া চলিয়াছেন তাহা দেখিয়া বাল্মীকির লজ্জায় মাথা নত করা উচিত। আধুনিক শিল্পী বিপুলকে সৃষ্টি করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টি করিতে পারেন না বৃহৎকে। বিপুল হইতেছে ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড জিনিষের পুঞ্জ, আর বৃহৎ হইতেছে একটি গোটা বস্তুর অখণ্ড মহত্ব। আধুনিকের গৌরব অক্টারলোনী মনুমেণ্ট—বড় জোর, "আর্ক দ' ত্রিয়োঁফ" (Arc de Triom-

phe)—কিন্তু প্রাচীনের গৌরব গোটা এক এক খানি পাথরের স্তম্ভ (monolith), সমগ্র একটা পাহাড় কুঁদিয়া তৈয়ারী মন্দির। মহাকাব্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে, আমরা আধুনিকেরা বলিয়া থাকি। কারণ দেই এই যে, বাহ্য-ঘটনা-পরম্পরার দিকে শিল্পী আর মন দিতে পারেন না, আধুনিক শিল্পী অন্তর্মুখী, তিনি বলিতে চাহেন ভিতরের জগতের রহস্যের কথা; তাই আজ-কাল হইতেছে বিশেষভাবে গীতিকাব্যের যুগ। কিন্তু আমার মনে হয়, আরও একটা কারণ এই, মহাকাব্য রচনা করিতে প্রয়োজন চিত্তের মধ্যে যে অবসর, যে স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য, যে টানা দম তাহা আধুনিকের নাই। গীতিকাব্য অল্প দমের রচনা, আর তাহা আমাদের চিত্তের চঞ্চলতার, প্রাণের দ্রুত গতির, মনের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির সহিত বেশ মিল খায়।

কিন্তু বস্তুর আকারগত বৈষম্য আসল কথা নয়, আধুনিকে ও প্রাচীনে বৈষম্য হইতেছে প্রকারগত। প্রাচীনশিল্পের ভাবে ও ছন্দে যে রহিয়াছে শান্তি তাহারই কল্যাণে ছোট হোক আর বড় হোক, বাহিরের দৃশ্য বা ঘটনা হোক আর অন্তরের অনুভব হোক প্রাচীনের সকল রকম সৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা গরিমার, মহত্বের, বৃহতেরই আভা। শান্তি অন্তরের ইন্দ্রিয়কে, বাহিরের ইন্দ্রিয়কে উদার প্রসারিত করিয়া ধরে, আর এই জন্যই সেখানে আসিয়া ধরা দেয় অন্তরের অসীমের স্বাচ্ছন্দ্য। শান্তির মধ্যেই গাঢ় হইয়া জমিয়া উঠে একটা আত্মস্থ সামর্থ্য। শান্তির স্বচ্ছতা দৃষ্টিকে লইয়া চলে গভীর হইতে গভীরে। প্রাচীনের ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি

এই শান্তির চরম ব্যঞ্জনা, পরাকাষ্ঠা গোচর করিয়া ধরিয়াছে—ইহা শুধু শান্ত মানুষটির প্রতিমূর্ত্তি নয়, এখানে শান্তিই মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছে। আধুনিক জগতের কোন দেশের কোন শিল্পে ইহার তুলনা নাই।

প্রাচীন শান্তিকে স্থিতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন, তাই বলিয়া গতির, বেগের, শক্তির ছন্দকে প্রকাশ করিতে যে কম দক্ষ এমন নহে। নটরাজের অঙ্গে অঙ্গে যে গতির আবেগের তোড় দুলিয়া দুলিয়া যেন গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, জানি না, আর কোন শিল্পী বিশ্বশক্তির তাণ্ডব এমন ভাবে প্রকট করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। তবে কথা এই, গতির পরাকাষ্ঠা তাঁহারা দেখাইয়াছেন কিন্তু স্থিতির উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া—স্থিতির প্রগাঢ়তা যেন গতির আবেগকে অধিকতর স্ফুট করিয়া ধরিয়াছে আবার গতিরও উদ্দেশ্য যেন ঐ স্থিতিকেই ফুটাইয়া ধরা—পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ। বিরাট শান্তিকে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহারই প্রকাশরূপে ছুটিয়া বাহির হইতেছে কি রকমে তীব্র কর্ম্মৈষণা—সে রহস্য প্রাচীনেরা জানিতেন, আমরা আজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালেও এই দুইটি আপাতবিরোধী ধর্ম্মের সামঞ্জস্য শিল্পীদের মধ্যে কখনও কোথায় যে, আদৌ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না তাহা নহে। ফলতঃ, শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ বিকাশ যেখানে সেখানেই অল্লাধিক পরিমাণে ইহার প্রমাণ দেখি। নীট্‌শ অবশ্য এই দুইটি ধারা হিসাবে দুই শ্রেণীর সাহিত্যের কথা বলিয়াছেন—

এক, যে সাহিত্যে মূর্ত্ত বিপুল গতি, আর, যে সাহিত্যে মূর্ত্ত বিশাল শান্তি। প্রথমটির উদাহরণ তিনি দিয়াছেন সেক্সপীয়র, আর দ্বিতীয়টির গ্যেটে। গ্যেটে অপেক্ষা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সৃষ্টির মধ্যে বোধ হয় ধরা দিয়াছে আরও নিথর নির্ব্বিকার শান্তি—কারণ, গ্যেটের শান্তি প্রধানতঃ স্থিরবুদ্ধিকে, উদার মেধাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে আর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শান্তি আসিয়াছে চিত্তের স্থৈর্য্য, প্রাণের সংযমকে ধরিয়া। সে যাহা হৌক, গ্যেটে বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চলনের মধ্যে এই শান্ত বা সমাহিত ভাবটি অতি প্রকট, ইঁহাদের সৃষ্টি কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্মরণ করাইয়া দেয় আমাদের ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তিকে। কিন্তু অন্তরাত্মার শান্ত-ভাব পিছনে অটুট রাখিয়া সম্মুখে কি রকমে প্রাণের উদ্বেল ছন্দ লীলায়িত হইয়া উঠিতে পারে, তাহারও নিদর্শন এই গ্যেটে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থই দিয়াছেন। গ্যেটের Walpurgus' Night ঝড়ের ছন্দে আন্দোলিত; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমস্ত Faustএর মধ্যে অনুভব করি কবি যে একটা উদার সমতা, প্রশান্ত দৃষ্টি, সমাহিত গতি প্রসারিত করিয়া ধরিয়াছেন তাহা কিছু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের যে প্রসন্ন উদাসীন চিত্ত

> Wandered lonely as a cloud
> That floats on high o'er vales and hills

যেখানে

> All was tranquil as a summer sea

তাহাতে প্রাণের আবেগ সঞ্চারিত হইলে আত্মস্থ থাকিয়াও

রকমে গতিমুখর হইয়া উঠিয়াছে তখন দেখি যখন শুনি কবি বলিতেছেন :—

Our bodies to the wind
And all the shadowy banks on either side
Came sweeping through the darkness, spinning
The rapid line of motion···the solitary cliffs
Wheeled by me.

সেক্সপীয়র বা মোলিয়ের তাঁহাদের সৃষ্টিতে গতির ছন্দটাই সম্মুখে প্রকট করিয়া ধরিয়াছেন ; কিন্তু সেখানেও তবু প্রাণাবেগের কর্ম্মপ্রেরণার যে বিপুল জটিল সংঘাত তাহারও পশ্চাতে অনুভব করি না কি দ্রষ্টার পুরুষের নিশ্চল শান্তি, একটা প্রসন্ন গভীরতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ? লাতিন-সাহিত্যের ছন্দভঙ্গে নিথর প্রশান্তি, স্থাণুর সমাহিত সান্দ্রভাব সর্ব্বজনবিদিত। গ্রীক ও সংস্কৃত পরম শান্তি ও পরম গতির অপরূপ সামঞ্জস্য দেখাইয়াছে—হোমরের হেক্সামিটারে (ষট্‌মাত্রা), কালিদাসের মন্দাক্রান্তায় একটা ধীর টানা গতি কেমন স্তব্ধতা আনিয়া দিতেছে প্লুতগতির মোড়ে মোড়ে। ফলতঃ, ছন্দ অর্থই কি তাই নয়—গতির মধ্যে যতি ? এই যতির কৌশলেই ছন্দের মাধুর্য্য। আর যতি অর্থ—শান্তির অবকাশ, অন্তর্মুখী হইবার প্রয়াস। সকল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই হইতেছে, যে-গতি চির-চঞ্চল, যাহা অনুভবকে এড়াইয়া এড়াইয়া চলিতে চাহিতেছে, তাহার এক মুহূর্ত্তের একটা ভঙ্গী স্থির করিয়া, গোচর করিয়া, চিরকালের দেখার বস্তু করিয়া ধরিয়া রাখা।

ভারতের শিল্প জগতের শিল্পের শীর্ষদেশে ঠিক এই জন্য—কারণ, ধ্যানের একতানতা, সমাধির নিরুপম শান্তি—the peace that passeth understanding—সে যেমন গোচর করিয়া ধরিয়াছে তেমনটি আর কেহ দেখাইতে পারে নাই। ভারতের চিত্র, বিশেষতঃ ভারতের ভাস্কর্য্য শিল্পের এই উত্তম রহস্যকে বুঝাইবার জন্যই যেন গড়িয়া উঠিয়াছে। গতির চঞ্চল আবেগ, শক্তির কর্ম্মাবর্ত্ত ভারতের শিল্পী যেখানে দেখাইয়াছেন সেখানেও তাঁহার প্রধান লক্ষ্য যেন ছিল কি রকমে স্থিতির শান্তিকে তন্ময়তাকে অটুট রাখা যায়। ভারতের চিত্রকলার সমস্ত কারিগরী রেখাসম্পাতে। তাহার দীর্ঘ বলয়িত রেখাবলীর মধ্যে পাই যেন যোগীর কি এক কুম্ভক প্রক্রিয়ার সমাহিত সামর্থ্য। ইহার অনুরূপ কিছু আর কোন দেশের কোন শিল্পে আছে কি না সন্দেহ।

এই মহান্ শান্তিমন্ত্র আধুনিকেরা যে হারাইয়া বসিয়াছেন তাহার হেতু কি, তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে? তবে অতীতের ইতিহাস আমাদের একটু আলোচনা করিতে হয়। সেই অতীতের ধারা কিছু অনুসরণ করিলে একটা বিচিত্র জিনিষ দেখিতে পাই। জড়জগতে Degradation of Energy শক্তির ক্রমিক হ্রাস বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা একটি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, শিল্পকলার ধারাতেও দেখি এই রকমই একটা যেন ক্রম-অবনতি চলিয়া আসিয়াছে। শিল্পসৃষ্টিতে অশান্তির অধীরতার আবেগ প্রথম ফুটিয়া উঠে বোধ হয় "রোমান্টিক" আন্দোলন হইতে। তাহার পরে দিন দিন ঐ জিনিষটি যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। শিল্পের

যাহারা প্রথম স্রষ্টা বা আদিপুরুষ তাঁহাদের মধ্যে অন্তরাত্মার স্থিতপ্রজ্ঞা ছিল অটুট অচলপ্রতিষ্ঠ, সেটি ছিল তাঁহাদের স্বভাবগত সিদ্ধি। একটা বৃহৎ চেতনার অটল শান্তি তাঁহাদের শিল্পরচনার ছিল নৈসর্গিক ভিত্তি। সেক্সপীয়র, মোলিয়ের, দান্তে, হোমর বাল্মীকি—প্রাচীনতম যে বৈদিক ঋষিগণ—ইঁহারাই ছিলেন এই যুগধর্ম্মের বিগ্রহ। বলিতে পারি, ইহাই শিল্পজগতের সত্যযুগ—সত্যকে সুন্দরকে শিল্পী যখন সমাধির বৃহৎ দৃষ্টি দিয়া সাক্ষাৎ দেখিতেন ও সাক্ষাৎজ্ঞানের প্রশান্ত তপঃশক্তি দিয়া রূপায়িত করিতেন। তারপর ত্রেতাযুগ, শিল্পী একধাপ নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। অন্তরাত্মার শান্ত বৃহৎ সাক্ষাৎদৃষ্টির পরিবর্ত্তে তখন বুদ্ধির চিন্তা-শক্তির প্রভাব প্রখর হইয়া উঠিয়াছে—এই যুগের শিল্পী হইতেছেন মিলতন, কর্ণেই, তাস্‌সো, সোফোকলা (Sophocles), কালিদাস। ইহাকেই বলে ক্লাসিকাল যুগ। উপরের যে জ্যোতি শিল্পসৃষ্টির মূল ও একমাত্র প্রেরণা হওয়া উচিত তাহার সম্মুখে মস্তিষ্কের বৃত্তি এখানে একটা যেন পরদা টানিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই যুগেও সেই পরদা ছিল খুব সূক্ষ্ম, এক রকম স্বচ্ছই ; মস্তিষ্কের একটা সত্ত্বগুণ, বুদ্ধির একটা ধারণ-সামর্থ্য এই যুগের শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও তাই স্থৈর্য্যকে শান্তিকে অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল। এই ক্লাসিকাল যুগের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ধীশক্তির পরিবর্ত্তে যখন দেখা দিল কেবল বিচার বিতর্ক, তখন মস্তিষ্কের আবরণ গাঢ়তর হইয়া উপরের আলোয় অবতরণের পথ রুদ্ধ করিয়া দিল—তখন আসিল Didactic Poetryর যুগ,

শিল্পের উদ্দেশ্য হইল কেবল শিক্ষাদান, প্রচারকার্য্য। তখনই আসিলেন ইংলণ্ডে মিলতনের পরে পোপ আর ফরাসীতে কর্ণেই ও রাসীনের পরিবর্ত্তে বোয়ালো। অর্থাৎ সত্যকার শিল্পসৃষ্টি কিছুদিন তখন বন্ধ রহিল। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তখন দেখা দিল জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা, তর্ক-বিতর্ক, বাদবিসম্বাদ, আলোচনা সমালোচনার তুমুল কোলাহল, মস্তিষ্ক-গত একটা বিপুল চাঞ্চল্য। শিল্পীর প্রেরণা সেদিকে কোন অবকাশ না পাইয়া পরের যুগে অবতরণ করিল আরও এক ধাপ নীচে—হৃদয়ে, চিত্তাবেগের ক্ষেত্রে। ইহা যেন শিল্পের দ্বাপর যুগ। এই যুগই হইতেছে যাহা রোমাণ্টিক যুগ নামে বিখ্যাত। এই যুগ হইতেই অশান্তির ধর্ম্মকে শিল্প যেন স্বধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিতে সুরু করিয়াছে। আবেগ ও উদ্বেগই দিয়াছে তখনকার শিল্পের ছন্দ ও সুর। রুসো বোধ হয় ইউরোপে এই ধারার প্রবর্ত্তক। ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যে ভবভূতির মধ্যে এই ধর্ম্মের ছায়া কথঞ্চিৎ দেখিতে পাইয়াছিলাম। অন্তরাত্মার নৈসর্গিক বৃহৎ শান্তি এখানে নাই, ক্লাসিকাল যুগ সে শান্তিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল যে স্থিরবুদ্ধি সমর্থ মস্তিষ্কের সহায়ে তাহা এখানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। চিত্তের উত্তেজনা—ইমোশনই হইয়া উঠিয়াছে এই যুগের শিল্পসৃষ্টির উৎস ও নিয়ামক। বায়রণ বলুন, শেলিই বলুন, এমন কি হিউগোই বলুন—সকলেই অশান্তির অবতার। তবুও এই যুগের এই সব স্রষ্টাদের স্বপক্ষে একটা কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইঁহাদের অশান্ত আবেগের মধ্যেও আবেগের তীব্রতার দরুণই হয়ত ছিল একটা কিছু মহত্ব, বৃহৎ

শক্তির একটা প্রভা। তার পরে আসিল কলিযুগ—হৃদয় বা চিত্তের আসন ছাড়িয়া শিল্পপুরুষ যখন নামিয়া পড়িয়াছেন আরও নীচে, প্রাণময় ক্ষেত্রে। ইহাই বর্ত্তমান যুগ। এই যুগের বিশেষ একটা নাম নাই—কারণ শিল্পরচনার কোন একটা বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতেছে না, যাহার যেমন অভিরুচি, প্রাণের যেমন খেয়াল সে সেই পথেই চলিয়াছে। তাই দেখি এত বহুল বিচিত্র রকমের আদর্শ নিত্যই মনে আবিষ্কৃত হইতেছে, দুই দিনের ফ্যাসান হইয়া আবার লোপ পাইয়া যাইতেছে। প্রাণের একটা বুভুক্ষা, অতৃপ্তি, আফশোষ, সেই সঙ্গে মনের সন্দেহ, জিজ্ঞাসা, তীব্র বিশ্লেষণপরায়ণতা—ইহাই যেন বর্ত্তমান যুগের মানুষের সাধারণ প্রকৃতি।

প্রাণের আবিল চাঞ্চল্যে আধুনিক শিল্পী অভিভূত। সকল শিল্প মূলতঃ হয়ত প্রাণেরই মধ্যে অন্তরাত্মার রূপায়ন, অন্তরাত্মার সহিত প্রাণের উদ্বাহ—প্রাণের ধর্ম্ম গতি হইতে পারে, কিন্তু অন্তরাত্মার ধর্ম্ম শান্তি। আধুনিক শিল্পীর সত্তা যেন দ্বিধা-খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার অন্তরাত্মার সহিত প্রাণের আর কোন সংযোগ নাই। অন্তরাত্মা গুপ্ত বা সুপ্ত অবস্থায়, প্রাণের উদ্বেলতাই সেখানে অতিকায় হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে উগ্র রুক্ষ হইয়া দেখা দিয়াছে কাটা-কাটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা তরল উচ্ছল ঢেউয়ের ঝিকিমিকি। আধুনিকের অধীর গতিতে সফরীর চঞ্চল প্লুত-ছন্দ মূর্ত্তিমান, কিন্তু প্রাচীনে যাহা রূপ পাইয়াছে তাহা হইতেছে সমাহিত অন্তঃস্তব্ধ মহাসাগরের বিপুল দোল। প্রাচীনের দীর্ঘ

বিস্তৃত দৃষ্টির পরিবর্তে আধুনিক পাইয়াছে সূক্ষ্মতর দৃষ্টি—প্রাচীনের অপেক্ষা আধুনিকের কৃতিত্ব যেন অণুবীক্ষণে। অথবা আমরা বলিতে পারি, প্রাচীনের ছন্দ যেন বেতার তড়িতের দূর-প্রসারিত তরঙ্গ (Hertzian waves) আর আধুনিকের ছন্দ ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ "রণ্ট্‌গেন" রশ্মির ঢেউ। আধুনিকের কৌতূহলী প্রাণ তাহার বুদ্ধিকে শাণিত ছুরিকার মত তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম করিয়া তুলিয়াছে—জিনিষকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া তাহার মর্ম্ম তন্নতন্ন করিয়া দেখিবার পরীক্ষা করিবার একটা অদ্ভুত নৈপুণ্য আধুনিকে পাইয়াছে। কিন্তু আধুনিকের যাহা নাই তাহা হইতেছে প্রাচীনের মত বস্তুর সমগ্রকে বেড়িয়া বিপুল আলিঙ্গনে ধরিয়া, তাহার সহিত অঙ্গে অঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়া, তাহার বৃহৎ ছন্দকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য। আধুনিকে আছে ঔৎসুক্য, গবেষণা, নূতন তথ্য আবিষ্কারের ক্ষমতা, বহুমুখতা, বৈচিত্র্য, আছে বোধ হয় কৌশল, চমৎকারিত্ব—কিন্তু নাই সৌষ্ঠব, নিটোল সৌন্দর্য্য, চিত্তে যাহা আনিয়া দেয় শান্তি, প্রীতি, তৃপ্তি।

আধুনিক যুগে শিল্পের এই যে পরিণতি, হয় ত ইহার একটা গভীর অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে। ইহা কেবলি অবনতি নয়, ইহার মধ্যেই বহিয়া গিয়াছে হয় ত একটা ক্রমোন্নতির ফল্গুধারা। ভবিষ্যতে একটা মহত্তর শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই হয় ত এই নূতন নূতন অভিজ্ঞার ধারা বিভিন্ন যুগে মানুষের চেতনাকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খলতা ও বিপুল চাঞ্চল্যের মধ্যেই এখানে ওখানে দুই একটি শিল্পীর মধ্যে এই ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস

যে পাই না তাহাও নয়। কিন্তু নূতন আমরা যাহাই করি না কেন, তাহা যেন প্রাচীনের অর্থাৎ সনাতনের বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করি—এই আদর্শই ফরাসী বিপ্লবের যুগের অথচ "ক্লাসিকাল" কবি আন্দ্রে শেনিয়ে (André Chenier) নবীন শিল্পীদের জন্ম দিয়া গিয়াছেন—

Sur les pensers nonveaux faire des vers antiques.

আধুনিকের সূক্ষ্মতা চাই কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠায় চাই প্রাচীনের বিপুলতা, আধুনিকের অর্থগৌরব চাই কিন্তু চাই তাহাকে ঘিরিয়া প্রাচীনের অঙ্গসৌষ্ঠব; আধুনিকের বিচিত্র গতিও বরণীয়, কিন্তু সর্বোপরি চাই প্রাচীনের গভীর শান্তি—কারণ, শান্তরসের ঋষি-কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কথায়,

The gods approve
The depth, and not the tumult, of the soul

উত্তরা
মাঘ, ১৩৩২

সমসাময়িক সাহিত্য

আয়র্লণ্ডের কবি ঈট্‌স্ (Yeats) যখন তাঁহার দেশে নূতন একটা সাহিত্যসৃষ্টির গোড়াপত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন যে প্রতিবন্ধকটি সকলের আগে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং যাহার সহিত তাঁহাকে বরাবর যুদ্ধ করিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহা এই—ব্যবহারিক-সংস্কারপ্রয়াসী সাহিত্যিক মন। আয়র্লণ্ডে তখন অন্যান্য দেশভক্তের মত সাহিত্যসেবীরও চিন্তাজগতে বিপুল অতিকায় হইয়া দেখা দিয়াছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যা সব—বিশুদ্ধ কবি যিনি, তিনিও তাঁহার কাব্য-সৃষ্টিকালে এই ভাবনাটি ভুলিতে পারেন নাই,—কি কাজ করিলে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচিতে পারে, সমাজের উন্নতি হয়। সত্যক শিল্পসৃষ্টির জন্য দরকার যে একটা উদার নির্ব্বিকার উদাসী শিল্পীদের প্রায় তাহা ছিলই না ; আশুকর্ম্মের আয়োজনে, নৈমি

প্রয়োজনের হিসাবনিকাশের মধ্যে তাঁহাদের চিত্ত মন এতখানি মজিয়া গিয়াছিল যে, সেখানে অহৈতুক আনন্দের সৃষ্টি হইবার কোন পথ প্রায় ছিল না। *

কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের এই যে অবস্থা ছিল, আজ আমাদের দেশে ঠিক তাহাই দেখিতেছি। শুধু তাই নয়, ঈট্‌সের কথাগুলি আয়র্লণ্ড অপেক্ষা বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধেই বোধ হয় বেশী প্রযুজ্য। আর আমার মনে হয় দিন যতই যাইতেছে, ততই যেন ঘোরতররূপে আমাদের সাহিত্যিকেরা ব্যবহারিক সংস্কারের সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেছেন। প্রবীণতরদের মধ্যে বরং কিছু দেখিতে পাই ঈট্‌সের সেই "disinterested contemplation" অর্থাৎ নির্লিপ্ত দৃষ্টির আভাস; কিন্তু নবীন যাঁহারাই আসিতেছেন, তাঁহাদের দেখি ভাবে ভঙ্গীতে কথায় ছন্দে কবির শিল্পীর লক্ষণ ক্রমেই লোপ পাইয়া চলিয়াছে, তাঁহারা যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন কেবল সংস্কারক হইয়া উঠিতে। আমাদের আজকালকার কাব্যজগৎ উপন্যাসজগৎ উপদেষ্টার ও প্রচারকের গর্জ্জনে মুখরিত, ঋষির প্রশান্ত সৌন্দর্য্যানুভূতি সেখানে অতি বিরল। নিরাবিল রসসৃষ্টির দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই, আমরা কহিতে চাহিতেছি কেবল "কাজের কথা"—পতিতের উদ্ধার,

* "All fine literature is the disinterested contemplation or expression of life, but hardly any Irish writer can liberate his mind sufficiently from questions of practical reform for this contemplation."

নারীজাতির উন্নতি, হিন্দু-মুসলমানে মিলন, ব্রাহ্মণের অত্যাচার, শাসকের উৎপীড়ন, দরিদ্রের দুরবস্থা, রাষ্ট্রের ও সমাজের গলদ, ব্যক্তিগত জীবনের অভাব ও আদর্শ—এই সকল সমস্যার মীমাংসা ও আলোচনা সাহিত্যেরও লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলকথা, সাহিত্য আর সুকুমার শিল্প নয়, আমাদের হাতে আজ তাহা হইয়া পড়িয়াছে নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র।

এ রকমটি হওয়ার কারণ অবশ্যই আছে। কোন দেশের সাহিত্য এক হিসাবে সেই দেশের সমষ্টিগত মনের ইতিহাস বা আলেখ্য। আমাদের দেশের অবস্থা যে রকম, তাহাতে বাহ্য জীবনের, কাজের সমস্যা গুলিই প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। রাষ্ট্রহিসাবে আমরা পরাধীন, এবং পরাধীনতার যত বিষময় ফল তাহা আমরা দেহে প্রাণে মনে অনুভব করিতেছি। পরবশ্যতার চাপে আমরা যতই সচেতন হইতেছি, ততই দেখিতেছি কি নিদারুণ দৈন্য কত দিক হইতে আমাদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবনকে হীন করিয়া রাখিয়াছে। দেশের সমস্ত জাগ্রত চেতনা তাই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এই অধঃপতন হইতে মুক্তির প্রয়াসে। যতই আমাদের চোখ ফুটিতেছে, ততই ছোটবড় নানা অভাব অভিযোগ বিবিধ বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইতেছে ; দেশের প্রাণও তাই আত্মরক্ষার ও আত্মোন্নতির জন্য ইহাদের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে এক একটি প্রতিক্রিয়ার শক্তি লইয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে ; দেশের মন গড়িতে চাহিতেছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আশু অব্যবহিত ফলের জন্য এক একটি ব্যবস্থা। জীবন-মরণের সমস্যা সব সদ্য সদ্য মীমাংসা করিবার

প্রয়াসে যে বিপুল তর্ক দেখা দিয়াছে—বাদ, প্রতিবাদ, উপদেশ, উচ্ছ্বাস—তাহাই মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে দেশের কণ্ঠ-সাহিত্যে। বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবার কথাটাই যেখানে সকলের বড় প্রশ্ন, সেখানে সাহিত্যে নির্লিপ্ত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অবকাশ কোথায়? আয়র্লণ্ডেও ঈট্‌স্‌ যে প্রকৃত সাহিত্যিক-ভাবের অভাব দেখিয়াছিলেন, তাহারও কারণ আমাদের দেশেরই মত আয়র্লণ্ডের বাহ্যিক অবস্থা।

কিন্তু আয়র্লণ্ডের অথবা আমাদের দেশের কথাই শুধু বলি কেন, সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া কি সাহিত্যের সেই একই ধরণধারণ ন্যূনাধিক পরিমাণে দেখিতে পাই না? সারা মানবসমাজ দুঃস্থ পীড়িত; কি রকমে তাহার সংস্কার ও উন্নতি হয়, এই চিন্তাই দেশে দেশে সাহিত্যিক মনকে আকৃষ্ট এবং অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। আজকালকার সাহিত্যের বিশেষত্বই এই যে, তাহা সমস্যামূলক (á thése)। নাটক ও উপন্যাসের ত কথাই নাই, আধুনিক কাব্যেরও প্রধান কথা দেখি হইয়া পড়িয়াছে আদর্শের ও কর্ত্তব্যের আলোচনা। বর্ত্তমান জগৎ ও মানব-সমাজ অতীতের তুলনায় বাস্তবিকই অধঃপতিত কি না, তাহা হয়ত বিচারের বিষয়; কিন্তু বর্ত্তমানের শিল্পীরা যে জগতের মানব-সমাজের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বেশী সজাগ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাহিত্যে এই যে জিজ্ঞাসার ধারা, ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন বোধ হয় ইব্‌সেন। ইব্‌সেনের ইংরাজ-শিষ্য বার্ণার্ড শ ত মূর্ত্ত এই জিজ্ঞাসা। ষ্ট্রিণ্ডবের্গ, বোয়ের, গর্কি, ইবানেজ, দান্নুণ্টসিও, রোলাঁ—ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এই সকল শিল্পী কেহই ত কখনও একেবারে ভুলিয়া

যাইতে পারেন নাই যে তাঁহারা প্রধানতঃ মানব-সমাজের ও মানব-চরিত্রের সংস্কারক।

তবুও ইউরোপের সহিত আমাদের দেশের একটু পার্থক্য আছে। ইউরোপে শিল্প হিসাবে সাহিত্যরচনার একটা মাপ বা আদর্শ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত চর্চ্চার ফলে, বড় বড় স্রষ্টাদের কল্যাণে, সেখানে সাহিত্যের এমন একটা সাধারণ রূপ ও রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে যে, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, সামান্য লেখককেও তাহার কাছাকাছি পৌছিতে হয়। সেখানে ব্যক্তিগত সাহিত্যিক দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তির অভাব দেশের সাহিত্যিক আবহাওয়া অনেকখানি পূরণ করিয়া দেয়। তাই সাহিত্যের মধ্যে অসাহিত্যিক ভাব ও ভঙ্গী প্রবেশ করিলেও তাহা সেখানে তেমন রূঢ় বা পীড়াদায়ক হইয়া উঠে না। কিন্তু আমাদের দেশে সাহিত্যের শিল্প-মূর্ত্তি খুব সাধারণভাবেও কোনরকম মাপের বা আদর্শের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া দাঁড়ায় নাই—এখনও তাহার যেন কাদামাটির অবস্থা। সুতরাং তাহা দিয়া আমাদের বেশীর ভাগ সাহিত্যসাধক যে শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর গড়িয়া ফেলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

শিল্পী ও সংস্কারক দুই পৃথক জগতের জীব। শিল্পী যে সংস্কারকের কাজ করিতে পারেন না, তাহা নয় ; কিন্তু অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য শিল্পকে তাঁহার ভুলিতে হইবে। আর যখন তিনি শিল্পরচনায় নিযুক্ত, তখনও তাঁহাকে ভুলিতে হইবে যে, তিনি সংস্কারক। আয়র্লণ্ডের ঋষিকল্প কবি জর্জ্ রাসেল co-

operation farming-এর একজন প্রচণ্ড কর্ম্মী ; এ বিষয়ে তিনি নিজে হাতেকলমে খাটিয়া আয়র্লণ্ডের জাতীয় জীবনে যে কতখানি স্বচ্ছলতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের সংস্কারকদিগের দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়। কিন্তু তাঁহার কাব্যে ত এ কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় নাই। কবি হিসাবে তাই বোধ হয় পৃথক একটা নামেই তিনি নিজেকে পরিচিত করাইয়াছেন —তিনি তখন আর জর্জ্ রাসেল নহেন, তিনি এ, ই, (A. E)। পূর্ব্বতন কবিরাও যে কখনও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, তাহা নয়—বাহ্যজীবনের আদর্শ ও কর্ত্তব্য লইয়া কথা যে তাঁহাদের কাব্যে স্থান পায় নাই, এমনও নয়। কিন্তু শেলী, বায়রণ, হিউগো অথবা ব্রাউনিং এমন একটা নির্লিপ্ত বৃহৎদৃষ্টি দিয়া এ সব বিষয় দেখিয়াছেন, এমন একটি ভঙ্গীতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনে হয় এ সকল কথা না বলিয়া অন্য কথা বলিলেও তাঁহাদের আসল কবিত্ব বা দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত না। তাঁহাদের কাব্যের মর্ম্ম বস্তুনির্দ্দেশের মধ্যে ততখানি নয় ; উহাকে শুধু আশ্রয়রূপে ধরিয়া, উহাকে ছাড়াইয়া চারিদিকে সুদূরবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে একটি ঊর্দ্ধতন কল্পলোক, তাহাই তাঁহাদের কবিতার স্বরূপ। আধুনিক সংস্কারক-শিল্পীদের হাতেও মাঝে মাঝে দেখি অতর্কিতে যেন সাহিত্যের এই দিব্যশরীর ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বার্ণাড´শ আর কোথাও এক মুহূর্ত্তের জন্যও সংস্কারকের সম্মার্জ্জনী হস্তচ্যুত করিতে পারেন নাই ; কিন্তু যখন কথঞ্চিৎ পারিয়াছেন তখন Candida-র মত এমন অপরূপ একখানি সুঠাম রসগর্ভ

শিল্পমূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। আর তখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, শিল্পী ও সংস্কারক-এ-পার্থক্য কি; চারিদিকের উষর ধূ ধূ মরু-প্রান্তরের মাঝে স্নিগ্ধ-তরুছায়া-মণ্ডিত কাননভূমির সৌন্দর্য্য অধিকতর স্পষ্ট ও মনোরম হইয়া দেখা দেয়। সমাজের নূতন নূতন সমস্যা, মানবপ্রাণের নূতন নূতন জিজ্ঞাসা ও কর্ত্তব্যের আলোচনা যে সুকুমার সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু এই সকল বস্তু বা উপকরণ সাহিত্যের রূপে ও রসে রূপান্তরিত ও রসায়িত করিয়া ধরিবার জন্য থাকা চাই একটা যাদুবিদ্যা, একটা মোহিনী শক্তি। উদাহরণ স্বরূপ এ বিষয়ে আধুনিক ফরাসী নাট্যকার বাতাই (Bataille) ও বের্ণ্‌ষ্টাইন (Bernstein)কে আমি শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চাই। *

আমাদের দেশে এই দিক দিয়া যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ হয় শরৎচন্দ্র। কিন্তু যিনি শিল্পসিদ্ধ তাঁহার পক্ষেও এই ধারায় চলিয়া শিল্পত্ব রক্ষা করা যে কত কঠিন, তাহার

* বেশীর ভাগ কতকগুলি অবান্তর কারণবশতঃ আমাদের দেশে আজকাল ফরাসীর প্রতিনিধিরূপে রোম্যাঁ রোলাঁ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আমি যে দুইজনের নাম করিলাম, আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের স্বরূপ তাঁহাদের মত এমন সংহত সামর্থ্যে, সুচতুর সুষমায় ও নিবিড় অর্থগৌরবে ভরিয়া আর-কেহ দেখাইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। আনাতোল ফ্রাঁসের কথা আলাদা। বাতাই'র "La Vierge folle" ও "La Femm Nue" এবং বের্ণ্‌ষ্টাইনের "La Griffe" ও "Montmartre" বাঙ্গালী শিল্পীকে আমি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের শেষ কয়েকটি প্রয়াস—যথা, "মুক্তধারা" ও "রক্তকরবী"। তাই আমি বলিতেছিলাম বাংলার সাহিত্য-জগতে অনাবিল রসসৃষ্টির পথে সংস্কারকের জিজ্ঞাসা বৃহৎ অন্তরায়ই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, আধুনিক বাংলা যদি যথার্থ রূপদক্ষতা দেখাইয়া থাকে, তবে তাহা হইতেছে চিত্রকলার ক্ষেত্রে। এখানে বাংলার প্রতিভা যেন সরাসরি উঠিয়া গিয়াছে শিল্পলোকের সমুচ্চ জ্যোতির্মণ্ডলে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ যে চিত্রজগৎ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই একটা সাক্ষাৎ প্রকাশ, একটা আবির্ভাব—এমনি স্বচ্ছন্দ, অকুণ্ঠ, আত্মস্থ, এমনি সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা—স্বে মহিম্নি। ইহার কারণ হয়ত একাধিক; কিন্তু আমার মনে হয় বিশেষ কারণ এই যে, সাহিত্যিকেরা যে প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়াছেন, বাংলার নবীন চিত্র-শিল্পীগণ সে দিক দিয়াই চলেন নাই; সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে গিয়া ইঁহারা আদৌ প্রচারক হইতে চাহেন নাই—আদর্শ, উপদেশ বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা লইয়া ইঁহাদের রস-পিপাসু অন্তরাত্মায় যে সত্য, যে তত্ত্ব আনন্দের বিগ্রহ হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহাকেই একাগ্র চিত্তে, সরল ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে তাঁহারা একটা সুচারু রূপায়নে ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাইবেল কথিত মার্থার মত ইঁহারা বাহিরের বহু বিষয়ের মধ্যে আপন চিত্তকে বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত করিয়া দেন নাই; কিন্তু মেরীর মত তাঁহারা তন্ময় হইয়া আছেন আসল যে একটিমাত্র জিনিষ তাহারই ধ্যানে—the one thing needful.

আমি বলিয়াছি, সাহিত্য হইতেছে সমাজের ইতিহাস বা

আলেখ্য। এক হিসাবে ইহা সত্য। এক দিক দিয়া দেখিলে সাহিত্য সমসাময়িক মনের প্রতিচ্ছবি বটে ; কিন্তু আর-এক দিক দিয়া সাহিত্য চিরন্তনের বিগ্রহ। এই শেষোক্ত হিসাবেই সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য অর্থাৎ চারুশিল্প। সমসাময়িক মন সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা বা পাদভূমি হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের শীর্ষ বা অন্তরাত্মা হইতেছে চিরন্তন। সমসাময়িককে চিরন্তনের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া চিরন্তনের চক্ষু দিয়া দেখাই সাহিত্যের কাজ। সমসাময়িক মন সমস্যার অর্থাৎ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র। সেখানে সত্যের যাচাই বাছাই ঢালাই পেটাই হইতেছে, সেখানে নূতন আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। এ কাজ দার্শনিক মনের হইতে পারে ; শিল্প কিন্তু নূতন সত্যকে আবিষ্কার করে না, বা তাহাকে বিচারের কষ্টিপাথরে কষিয়া পরীক্ষাও করিতে বসে না। শিল্প দেখাইতেছে চিরন্তন সত্যের রূপায়ন ; শিল্পীর কাছে সত্য আবির্ভূত একটা যেন চির-পরিচিত, চির-পুরাতন, সনাতন, নিত্যসিদ্ধ রূপ লইয়া। সাহিত্যের সত্য জন্ম লইয়াছে একটা প্রশান্ত স্থিতির মধ্যে, দেশকাল পাত্রাতীত একটা বৃহতের একটা ভূমার মধ্যে। সত্যের এই যে স্বরূপ— সাংখ্যের পরিভাষায়, তর্কের ক্ষেত্রে কর্ম্মের ক্ষেত্রে তাহার কোন 'বিকৃতি' নয়, কিন্তু সাক্ষাৎজ্ঞানের মধ্যে তাহার যে 'প্রকৃতি'— তাহা দেখিয়া ও দেখাইয়াই শিল্পী নিশ্চিন্ত। তিনি আপনাকে সর্ব্বদা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন আপন অন্তরাত্মার অপরোক্ষ অনুভূতির নির্দ্বন্দ্ব মহিমায়। তাঁহার সত্য যে কতখানি সত্য, সত্যের প্রভাব যে কত বহুল বিপুল, তাহা তিনি ফলাইয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত

নহেন। সুন্দরের যে সত্তাগত সত্তা, যে স্বভাবগত রসাত্মক শক্তি, তাহা স্বয়ম্প্রকাশ, স্বয়ংক্রিয়—তবে হয়ত দার্শনিকের বা সংস্কারকের ইচ্ছামত লক্ষ্যে ও পথে নয়। কবির মনে তত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসা, আলোচনা প্রবৃত্তি, কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসা থাকিতে পারে, থাকাও উচিত —কিন্তু শিল্পসৃষ্টিকালে এসব থাকিবে গোপনে অন্তরালে। মাটির মূর্ত্তি গড়াইতে হইলে তাহাতে খড়কুটা অনেক জিনিষই আবশ্যক হয়, কিন্তু সে সব জিনিষকে ত বাহিরে আর ধরিয়া দেখান যায় না। কবি গ্যেটের মত এমন একজন অতৃপ্তজিজ্ঞাসু, এমন একটি দার্শনিক মন খুব কম কবির মধ্যেই পাওয়া যায়; তবুও এই গ্যেটেই বলিতেছেন—The poet needs all philosophy, but he must keep it out of his work.

সবুজপত্র
পৌষ, ১৩৩২

বাঙ্গালীর কবিত্ব

কবিতার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ইউরোপের জনৈক মনীষী বলিতেছেন যে, কবিতা চিত্তাবেগের রাগে রঞ্জিত চিন্তা। অবশ্য কবিতার এই ব্যাখ্যাটি যে খুব সূক্ষ্ম বা গভীর, তাহা আমি মনে করি না। তবে আপাততঃ এটি গ্রহণ করিতেছি এবং এই কথা দিয়াই আমার আলোচনা সুরু করিতেছি এই জন্য যে, তাহাতে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। কারণ আমি বলিতে চাই, বাংলার কাব্যে চিন্তাসম্পদের বড় মহিমা নাই, সেখানে যাহা আছে তাহা চিত্তাবেগের প্রাচুর্য্য—বাংলার নিজের এক কবির কথায়, "প্রাণেরই প্রচুর স্পন্দন রে"। ফলতঃ, যদি বলা যায় বাংলা কাবতা মূর্ত্ত ভাবমত্ততা বা ভাবোন্মত্ততা, তবে বিশেষ অন্যায় হইবে না—কথাটা কেবল দোষের হিসাবে আমি বলিতেছি না, গুণের হিসাবেও বলিতেছি। বাংলার কাব্যসৃষ্টির আসল গোড়াপত্তন হইয়াছে

ভক্তদের—প্রধানতঃ বৈষ্ণব-ভক্তদের হাতে। পদাবলীর সুরই বাংলার কবিতার প্রধান সুর। বাঙ্গালীর আদি কবি চণ্ডীদাস যে তান দিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহার মূর্চ্ছনা আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর কাব্যজগতে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বাংলার কীর্ত্তন, বাংলার বাউল যে বাঙ্গালীর অতি নিজস্ব সম্পদ, তাহাও বাঙ্গালীর রসানুভবের ও রসসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যটিকেই ধরিয়া দেখাইতেছে। সে বৈশিষ্ট্য কি? না প্রাণের উদ্বেগ উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের তীব্র ভাবালুতা, সুকুমার মর্ম্মের কেমন অন্ধ একাগ্র তন্ময়তা।

এমন জিনিষটি পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। আমার চোখে ত পড়ে না, নির্জ্জলা ভাবাবেগ দিয়া কোথাও এমন একটা কাব্যজগতই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে আনাক্রেয়ন (Anacreon) ও লাতিন সাহিত্যে কাতুল্ল (Catullus) ছিলেন; ফরাসীর রঁসার (Ronsard), জার্ম্মানীর হায়েন (Heine) ও ইংরাজের বর্ন্‌স্ (Burns) বা কিয়ৎপরিমাণে শেলীর (Shelley) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের সকলেরই খুব তীব্র একটা ভাবোল্লাস বা lyric enthusiasm ছিল, সন্দেহ নাই। ইঁহারা ছাড়া আরও অনেকানেক কবির মধ্যে যে এই জিনিষটি অল্পবিস্তর পাওয়া যায় না, এমনও নয়; কিন্তু মোটের উপরে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখি এই ভাবোল্লাসকে শৃঙ্খলিত সুসংহত সুষীম করিয়া রাখিয়াছে আর একটা বৃত্তি, একটা চিন্তাশীলতার সবল রেখা—সে চিন্তা অবশ্য শুধু মস্তিষ্কপ্রসূত তর্কবুদ্ধিজাত

নাও হইতে পারে, তাহা হয়ত হৃদয়াবেগের স্পর্শে জাগরিত আন্দোলিত আর-এক ধরণের জ্ঞানভূমি ; তবুও তাহাতে পাই একটা সজাগ সমর্থ বুদ্ধিরই আভাস, মনে হয় হৃদয়াবেগ সেখানে মস্তিষ্কেরই একটা উর্দ্ধতর প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ রূপান্তরিত হইয়া সুঠাম অর্থপূর্ণ স্থিরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালীর কাব্য-প্রেরণা যেন হৃদয়ের প্রাণের স্তরের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বহিয়া চলিয়াছে, এই স্তরে আবদ্ধ থাকিয়া শুধু এই স্তরেরই গভীরতর অন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে ; মস্তিষ্কের অন্বীক্ষা ও অন্বয় তাহাতে কিছু নাই, তাহাতে আছে একান্ত চিত্তাবেগেরই অন্বীক্ষা ও অন্বয়। তাই বাঙ্গালীর কবিত্ব যেন স্রোতের মত কোমল, তরল, নিত্যগতিময় ; কোন মুহূর্ত্তে কোনরকম কাঠিন্য বা স্থৈর্য্য সে লাভ করে নাই।

শেক্সপীয়রের এই গীতিকবিতাটি আমাদের সকলেরই হয়ত জানা আছে—

Take, oh ! take those lips away,
That so sweetly were forsworn,
And those eyes, the break of day,
Lights that do mislead the morn :
But my kisses bring again,
Bring again—
Seals of love, but seal'd in vain,
Seal'd in vain !

ইংরাজী সাহিত্যে এটি sheer lyricism বা ভাবৈকতানতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু এখানেও ভাবমত্ততার সাথে সাথে বা তাহাকে অতিক্রম করিয়া নাই কি, মস্তিষ্কের মধ্যে পৃথক একটা চিন্তারও আন্দোলন, এলিজাবেথীয় যুগের নিজস্ব একটা কারুকল্পনার লাস্য? অথবা শেলীর এই মর্ম্মোচ্ছ্বাস—

I fear thy kisses, gentle maiden ;
Thou needest not fear mine ;
My spirit is too deeply laden
Ever to burthen thine.

এখানে অনুভব হয় যেন সকল চিন্তাবৃত্তি মস্তিষ্কের গতি এক প্রকার স্তব্ধই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও, শুনুন এবার একটু আমাদের বৈষ্ণব কবিদের বাণী—

বঁধুয়া! কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি॥

অথবা,

সখিরে! কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

এখানে আমরা একেবারে হৃদয়ের রসের কূপে ডুবিয়া গিয়াছি, এখানে যে আবেগে আচ্ছন্ন আমরা, তাহাতে জ্ঞানবুদ্ধির কোন রশ্মির এতটুকু প্রবেশপথ নাই, মর্ম্মের কোন নিগূঢ় একতারায়

এখানে ঝঙ্কার দিতেছে মর্ম্মেরই আদিম সুরটি, এখানে শুনি শুধু হৃদ্‌পিণ্ডেরই তালে তালে মন্ত্রিত এক অনাহত নাদব্রহ্ম।

ইহাই বাঙ্গালীর কবিত্বের বনিয়াদ, আর ইহাই যেন চিরকালের জন্য বাঁধিয়া দিতে চাহিতেছে বাঙ্গালীর কবিত্বের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম। আধুনিক বাংলার কবি-চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথও মূলতঃ এই বৈষ্ণবভক্তদিগেরই উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব এবং হয়ত অনেকখানি তাঁহারই কল্যাণে আধুনিক বাংলারও বিশেষত্ব এইখানে যে, পূর্ব্বতন কবিদের স্বভাবসিদ্ধ একমুখী চিত্তাবেগ এখন বহুবিধ চিন্তার সেবায় নিযুক্ত হইয়া বিচিত্র ও প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে। তবুও একটা কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সত্ত্বেও, আধুনিক কালধর্ম্মের প্রভাব সত্ত্বেও, বাংলার চিন্তা ও চিত্ত মিলিয়া মিশিয়া এখনও সে নিবিড় রসায়ন তৈয়ার করিতে পারে নাই, যাহা কাব্যের কবিত্ব; এখনও যেন মনে হয় ঐ দুইটি বস্তু তেল ও জলের মত বাঙ্গালীর কাব্যে পাশাপাশি থাকিয়াও আলাদাই রহিয়া গিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে সে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে নাই। বঙ্গীয় কবির চিত্ত চিন্তার ক্ষেত্রে আপনাকে তুলিয়া ধরিতে হয়ত চাহিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না; প্রাণকে জ্ঞানের মধ্যে উঠাইয়া কি প্রকারে রূপান্তরিত করিয়া ধরিতে হয়, সে রহস্যের সন্ধান বাংলার কবিপ্রতিভা এখনও পায় নাই। আর দ্বিতীয় পথ যে, চিন্তাকে চিত্তের স্তরে নামাইয়া আনা, চিত্তের খোরাকরূপে ধরিয়া দেওয়া—তাহা কথঞ্চিৎ বাঙ্গালীর স্বভাব ও স্বধর্ম্মের অনুকূল হইলেও, সেখানেও সম্যক

সিদ্ধিলাভ সে করে নাই। এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় বাঙ্গালী কবি যাহা করিতেছে তাহা প্রধানত চিন্তাকে আবেগের রঙে একটু রঙীন করিয়া ধরা, মস্তিষ্ককে একটা প্রাণের বাহ্য আবরণ পরাইয়া দেওয়া, অথবা আবেগ-স্রোতের মধ্যে বিসদৃশ চিন্তারাজি ছড়াইয়া দেওয়া।

বাঙ্গালীর কাব্যে তাই দেখি দুই দিক হইতে দুই রকমের অকবিত্বের ছায়া বা রসভঙ্গের দোষ স্পর্শ করিয়াছে। এক, যখন একান্ত ভাবাবেগে সে চলিয়াছে বটে কিন্তু ভাবস্থির হইতে পারে নাই, তখন গভীরে যাইতে না পারিয়া উপরের ভাসা ভাসা চাঞ্চল্যে সে উদ্বেগ-উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কাব্য হইয়া পড়িয়াছে কেবল বাগাড়ম্বর (Rhetorical); আর, যখন সে তাহার সৃষ্টিতে চিন্তাবস্তু কিছু দিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহা হইয়া পড়িয়াছে নীতিশাস্ত্র (Didactic)। বাঙ্গালীর কবিত্ব বেশীর ভাগ—বিশেষতঃ আধুনিক যুগে—দেখি এই দুই প্রান্তের দুই অতিমাত্রার মধ্যে দোল খাইয়া চলিয়াছে। তবে এই উভয় ভঙ্গীরই মূলে রহিয়াছে বোধ হয় এক জিনিষ—চিন্তাকে কাব্যরসে ভিজাইবার, পরিপাক করিবার অসামর্থ্য। এই অসামর্থ্যকেই পূরণ করিয়া লইবার ব্যস্ততায় পড়িয়া বাঙ্গালী কবি হয় একদিকে চিন্তাকে ঠেলিয়া রাখিয়া কপট অন্তঃসারশূন্য আবেগে কেবল শব্দজাল তৈয়ার করিয়াছে, নতুবা অন্যদিকে মস্তিষ্ককে অত্যধিক খাটাইয়া চিন্তাকে ফলাইতে গিয়া শুধু তত্ত্বকথা শুনাইয়াছে।

বাঙ্গালীর কবিত্ব সার্থক হইয়াছে তখনই, যখন চিন্তার বা

মস্তিষ্কের কথা তাহার আদৌ মনে পড়ে নাই, সেদিকে কোন লুব্ধদৃষ্টি দেয় নাই বা কষ্টপ্রয়াস করে নাই ; পরন্তু সহজ অনুভবের একান্ত আবেগে চলিয়া যখন সে সৃষ্টি করিয়াছে ভাবময়, ভাব-বিগলিত চিন্তা (vital thoughts)—বৈদিক ঋষির ভাষায় যাহার নাম মরুৎ-বাহিনী—যতক্ষণ তাহার চিন্তা চিত্তাবেগেরই স্রবণ এবং উৎসেচন। এই ভাবুকতা যতক্ষণ আপন গণ্ডী পার হইয়া যায় নাই, চলিয়াছে একটা সঙ্কীর্ণ খাতে, একটা বিশেষ অনুভবের ধারায়—তদবধি সেই সঙ্কীর্ণতার তীব্র তন্ময়তার জোরেই তাহা পাইয়াছে একটা নিবিড় গভীরতা, একটা প্রগাঢ় উপলব্ধি। বঙ্গীয় কবির বুক ফাটিয়া বাহির হইয়াছে এই যে উচ্ছ্বাস—

বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম—

এই অন্ধ ভাবমুগ্ধতা চিন্তাবৃত্তির কাছ-কিনারা দিয়াও যায় নাই, তর্কবুদ্ধির সকল ব্যাকরণ একটা দুর্ব্বার আবেগে হেলায় ভাসাইয়া দিয়াছে; অথচ কি এক একাগ্র তীব্রতার তীক্ষ্ণতার ফলে দেখি সে অনুভব কেমন প্রায় চক্ষুষ্মান জ্ঞানভাস্বরই হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানের আছে একটা উপলব্ধি। জ্ঞানের আছে সাক্ষাৎ দৃষ্টি, আর ভাবের আছে সাক্ষাৎ স্পর্শ—উভয়ই অপরোক্ষ উপলব্ধি। বঙ্গীয় কবির মধ্যে ঋষির উজ্জ্বল পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি তেমন নাই, আছে ভাবুকের ও মরমীর অপরোক্ষ স্পর্শালুতা।

কবিত্বের এই যে দুইটি উৎস, ইহাদিগকে ধরিয়া দুই প্রকারের কবিতা সৃষ্ট হইয়াছে। কবিতায় আমরা যাহাকে বলিলাম এক

জ্ঞানের ধারা আর এক ভাবের ধারা, ইংরাজ-কবি কোল্‌রিজ (Coleridge) তাহারই নাম দিয়াছিলেন masculine ও feminine poetry—পুরুষালী ও মেয়েলী কবিতা। আধুনিক যুগে প্রায় সর্ব্বত্রই দ্বিতীয় রীতিটিরই প্রাদুর্ভাব দেখি বেশী। যাহাকে আজকাল আমরা বলি মিস্‌টিক্ কবিতা, তাহা ইহারই রকম-ফের। যাহা হোক, নিছক প্রথম ধারার যে কবিতা—অর্থাৎ যে কবিতার রস ভাবলাস্যে নয় কিন্তু চিন্তাসামর্থ্যে, মাধুর্য্যে ততখানি নয়, যতখানি শক্তির ব্যঞ্জনায়,—তাহার সহিত তুলনা করিলে বঙ্গীয় কবিতার বিশেষত্বটি আরও স্পষ্ট হইবে। পাশ্চাত্যের গ্যেটে বা সোফোকলা কিম্বা প্রাচ্যের মহাভারতকার বেদব্যাসের সৃষ্টিতে (বা তামিলখণ্ডের তিরুবল্লুবরের মধ্যে) পাই যে অর্থগৌরব, যে তপঃপ্রভা, যে একটা কাঠিন্স, তাহা বাংলার নরম মাটিতে ভিজা হাওয়ায় বিকশিত হইতে পারে নাই। মধুসূদনে যে একটা সংহত প্রাণশক্তির প্রকাশ দেখিয়াছিলাম, অথবা বিবেকানন্দের দুই-চারিটি কবিতায় যে সবল মস্তিষ্কের কিছু আভাস পাইয়া-ছিলাম, তাহা বাঙ্গালীর কাব্যপ্রতিভায় আপনার বস্তু হইয়া উঠিল কই? বাঙ্গালীর যতটুকু খাঁটি কবিত্ব, তাহা ফুটিয়াছে কেবল বৈষ্ণব কবিতায় ও বৈষ্ণব-ভাবের কবিতায়।* বাঙ্গালী

* বৈষ্ণব-ধারা ব্যতীত বাঙ্গালীর কাব্যে আছে অবশ্য শাক্ত-ধারা—কিন্তু এই পার্থক্য প্রধানত বিষয়গত, উভয়ের ভঙ্গী বা মূলসুর একই। শাক্তের ভক্তি ও বৈষ্ণবের প্রেম, দুইয়েরই উৎস অভিন্ন—তাহা বৈষ্ণবী ভাব বলিলে অন্যায় হয় না।

কবি তাহার এই সঙ্কীর্ণ রসাল-চিত্তকে যখনই উদার ও বহুমুখী করিয়া ধরিতে চেষ্টা পাইয়াছে, অথবা তাহাতে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছে চিন্তা-জগতের বৈচিত্র্য, তখনই তাহার কাব্য দেখি বেশীর ভাগ হইয়া পড়িয়াছে পদ্য—তরল বা উচ্ছল বিবৃতি, নাই যাহাতে ইন্দ্রজাল, নাই যাহাতে কবি কীট্‌সের সেই "magic casements"-এর কোন আভাস।

বাঙ্গালীর কাব্যে এই যে বৈষ্ণব-সুরের কথা আমরা বলিলাম, একটু বৃহত্তর অর্থে তাহাই গীতিকাব্যের সুর। ফলতঃ, বাঙ্গালীর চারুসাহিত্য বিশেষভাবে গীতিকাব্যেরই সাহিত্য, এরূপ বলা অত্যুক্তি নয়। বৃহৎ বিচিত্র আয়তন লইয়া একটা সৃষ্টি, স্থাপত্যের বিশাল জটিল সৌন্দর্য্য বঙ্গসাহিত্যে যে দুর্লভ, তাহারও কারণ ঠিক এইখানে। আমাদের দেশে নাটকের যে একান্ত অভাব, তাহা আজকাল সকলেই একরকম স্বীকার করিতে প্রস্তুত। উপন্যাসেরও অভাব বড় কম নয়। আমি অবশ্য বলিতেছি নাটকের মত নাটক, উপন্যাসের মত উপন্যাসের কথা, শেক্স্‌পীয়র ও বাল্‌জাকের সৃষ্টির মত সৃষ্টি। বাঙ্গালীর নাটক যাহা আছে, উপন্যাস যাহা আছে, তাহা তখনই এবং ততটুকুই সত্য ও সুন্দর হইয়াছে, যখন ও যতটুকু তাহা গীতিকাব্যের প্রেরণায় চলিয়াছে। বাঙ্গালীর বৃহত্তর কাব্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ইদানীন্তন কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, ইঁহাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা কতদূর প্রযোজ্য, তাহাও দেখিবার বিষয়।

বাঙ্গালী বিশেষভাবে ভক্তিমার্গের সাধক, জ্ঞানপন্থী সে সহজে

হইতে চাহে না বা পারে না। ভক্তি-সাধনা বাঙ্গালীর প্রতিভাকে সঙ্কীর্ণ ও তীব্র করিয়াছে বটে, কিন্তু বিশাল ও বিচিত্র করিতে পারে নাই। বিশালতা ও বৈচিত্র্য জ্ঞানের দান। ভাবাবেগ বা অনুভবের ধর্ম্ম এই যে, একসঙ্গে সে বহুদিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না—পতঞ্জলির কথায়, "একসময়ে চোভয়ানবধারণম্," এক সময়ে তাহার দুইটি জিনিষের উপর অভিনিবেশ হয় না। এ কাজটি জ্ঞানের কাজ, বুদ্ধির কাজ। মস্তিষ্কই সেই কেন্দ্র, যাহা একসূত্রে বহুল বিচিত্র অনুভবকে সংগ্রথিত করিয়া রাখে। বুদ্ধিশক্তি, চিন্তাশীলতা সহজেই আনিয়া দেয় একটা শান্ত উদাসীনতা, উদার অপক্ষপাতিতা, একটা দ্রষ্টার ভাব,—যাহার কল্যাণে পুরুষ একাধিক এবং পরস্পরবিরোধী বস্তুরাজির উপর একসঙ্গে সমান মনঃসংযোগ করিতে পারে। ঠিক এই বৃত্তিটির উপর বাঙ্গালী কবির তেমন অধিকার নাই বলিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে বৃহত্তর কাব্য, নাটক, উপন্যাস গড়িয়া উঠিতেছে না। এই সকল সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন বহুতর ও বিবিধ দেশ কাল ও পাত্রের সহিত সমান পরিচয় ও সহানুভূতি, নানাবিধ ভাবধারাকে, তাহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া,—শুধু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নয়, সুস্পষ্ট ফুটাইয়া তুলিয়া,—একটা বৃহৎ দৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা। আর সে ক্ষমতা আছে সচল মস্তিষ্কের,—বাঙ্গালীর স্বাভাবিক একরোখা ভাব-বিহ্বলতা সে ক্ষমতার অন্তরায়।

সবল মস্তিষ্কের রাসায়নিক প্রতিভা কি বাঙ্গালী কবি অর্জ্জন

করিতে পারিবে না? এই প্রতিভা কি তাহার প্রকৃতির মধ্যে, অন্ততঃ সুপ্ত চেতনায় কোথাও নাই? বাঙ্গালী ভক্তিমার্গী, জ্ঞানমার্গী নয়, তাহা আমি বলিয়াছি। বাঙ্গলার মাটিতে শ্রীচৈতন্যেরই আবির্ভাব হইয়াছে, শঙ্করের আবির্ভাব হয় নাই। সত্য কথা। কিন্তু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ? ধর্ম্ম-সাধনায় এই যুগলপ্রতিভা যে অভিনব সুর বাঙ্গলীর চেতনায় প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, কাব্য-সাধনাতেও তাহারই অনুরূপ সুর একটা প্রকট হইয়া বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

সবুজ পত্র
চৈত্র, ১৩৩২

* প্রবন্ধটি পড়িয়া একটা ধারণা হইতে পারে যে, আমি বুঝি বলিতেছি বাঙ্গালীর চিন্তা বা বুদ্ধি-স্থানে একেবারে শূন্য। তাই এই কথাটি এখানে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমার বক্তব্য বিশেষভাবে কেবল কাব্য-সৃষ্টি লইয়া। তা ছাড়া বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক বা চিন্তাবৃত্তি যে কোথায় খেলিয়াছে, তাহা কি ধরণের ও কি দরের, সে কথা অন্যত্র বলিতে চেষ্টা করিব।

বীরভাব

খৃষ্টেরও মুখ হইতে এ কথাটি আমরা শুনিতে পাই—I came not to send peace, but a sword—তিনি শান্তিস্থাপনের জন্য আসেন নাই, তিনি আসিয়াছেন অসিহাতে যুদ্ধের জন্য। শুধু কথায় নয়, কার্য্যতও এক সময়ে কশাঘাতে তিনি যেরুসালেমের বণিকদিগকে তাহাদের পণ্যশালা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। তবুও খৃষ্টের ধর্ম্ম শাক্তধর্ম্ম ছিল না, তাহা ছিল অতিমাত্রই প্রেমের ধর্ম্ম। আবার বুদ্ধ যাঁহাকে আমরা জানি করুণারই অবতার বলিয়া, যিনি বিশ্বের দুঃখে কাঁদিয়া ফিরিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ততখানি কান্তস্বভাব ছিলেন না, যতখানি ছিলেন শক্তির বিভূতি—শুধু তাহাই নয়, শাক্যসিংহের মধ্যে যে শক্তি খেলিয়াছে তাহা শান্ত রসাস্পদ বলিয়া মনে হয় না, তাহার প্রতিষ্ঠা তাহার প্রাণ বীরভাব, এমন কি একটা রুদ্রভাবেরই মধ্যে।

তাঁহার সাধনপ্রণালী, তাঁহার কর্ম্মের ভঙ্গিমার মধ্যে কেমন এক তপ্ত তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যখন বোধিদ্রুমতলে প্রায়োপবেশনে বসিলেন, যখন তাঁহার অন্তরাত্মা গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল, "এই আসন গ্রহণ করিলাম, শরীর যায় আর থাক, সিদ্ধি ব্যতিরেকে এখান হইতে উঠিব না"—ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং—তখনই পাই বুদ্ধের প্রাণের ধর্ম্মের ইঙ্গিত। পুরাতন বৈদিক ধর্ম্মকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবার জন্যই তিনি অসিয়াছিলেন; কোন ভগবান, কোন দেবতা, কোন কিছু সত্তার উপর ভর করিয়া তিনি তাঁহার সাধনাকে দাঁড়াইতে দেন নাই—তাঁহার ধর্ম্ম নিরালম্ব, এক উগ্র তপঃশক্তির বলে ক্ষণিকবেদনা-সমষ্টি এই যে সৃষ্টি তাহাকে ধ্বংস করিয়া নির্ব্বাপিত হওয়া, শূন্যে মিলিয়া যাওয়াই নিঃশ্রেয়স।

মানুষ কি বলে, কি ভাবে, কি চায়, কি করে, সেই বস্তুর মধ্যে প্রকৃত মানুষটিকে ঠিক ততখানি পাই না, যতখানি পাই সেই বলার, সেই ভাবার, সেই চাওয়ার, সেই করার ভঙ্গিমার মধ্যে। অন্তরাত্মার যে মূল ভাব, যে বিশিষ্ট আবেগটি তাহা অঙ্কিত হইয়া চলিয়াছে উপকরণাদির গঠনের চলনের ভঙ্গিমারই মধ্যে—মানুষকে চিনিতে হইলে, তাহার স্বরূপ ধরিতে হইলে, পারি এই জিনিষটির সহায়ে। কারণ আর সকল জিনিষ মানুষ সহজেই আহরণ করিতে পারে, বাহির হইতে অন্যের নিকট হইতে জ্ঞানতঃ হোক অজ্ঞানতঃ হোক ধার করিয়া লইতে পারে—আর সব জিনিষ সম্বন্ধে মানুষ ভাণ করিতে পারে, আপনাকে লুকাইতে পারে কিন্তু ভঙ্গীর মধ্যে সে চিরদিনই আসিয়া ধরা পড়ে। তাই ফরাসী মনীষী বুফন (Buffon)

বলিয়াছেন—Le style c'est l'homme—রচনার যে ভঙ্গী সেখানেই রহিয়াছে সমগ্র মানুষটি। জগৎকে জীবনকে সে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতেছে, তাহার জীবনের শাস্ত্র কি, তন্ত্র কি সমস্তই প্রতিফলিত এই styleএর মধ্যে। এইখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রাণের ধর্ম্ম ; এখানে যাহা নাই সে সব হইতেছে তাহার বুদ্ধির ধর্ম্ম।

বুদ্ধির ধর্ম্ম আর প্রাণের ধর্ম্ম—মানুষের আছে এই দুই ধর্ম্ম। কিন্তু ইহাদের একটি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ আর-একটি আরোপ মাত্র, অন্যূন পক্ষে তাহার সাধ্য বা আদর্শ বস্তু। একটি কল্পনার রচনা, আর-একটি নৈসর্গিক সৃষ্টি, একটিকে ধরিতে প্রয়াস করিতে হয়, আর-একটি অযত্নসুলভ, আপনিই আসিয়া ধরা দেয়। মানুষের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, জাগতিক প্রতিষ্ঠানে তাহার মূল্যটি নিরূপণ করিতে হইলে এই প্রাণের ধর্ম্মই হইতেছে যথাযথ মানদণ্ড। বুদ্ধির ধর্ম্মটি যতখানি প্রাণের সহিত একীভূত হইয়াছে ততখানিই সে ধর্ম্ম জাগ্রত, জীবন্ত, কর্ম্মকুশল। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম্মের অর্থ এই প্রাণের ধর্ম্ম। প্রাণের ধর্ম্মই হইতেছে স্বধর্ম্ম, বুদ্ধির ধর্ম্মের সহিত পরধর্ম্মেরই একটা স্বাজাত্য আছে।

হইতে পারে প্রাণের ধর্ম্মটি অপেক্ষা বুদ্ধির ধর্ম্মটিই উচ্চতর মহত্তর। বুদ্ধির ধর্ম্ম দেখাইতেছে আমার আদর্শকে, আমি কি হইতে চাহিতেছি। আমি কি হইতে চাই, আমার আকাঙ্ক্ষা কি তাহার একটা মূল্য আছে, বিশেষ মূল্যই আছে—কিন্তু আশার কল্পনায় যে মর্য্যাদা আমার নিভৃত ব্যক্তিগত সাধনার পক্ষে তাহা

যতই বৃহৎ হোক না কেন, যতক্ষণ সে সব আমার প্রাণে সজীব হইয়া উঠে নাই ততক্ষণ সত্য হইয়াও উঠে নাই, ততক্ষণ আমার অন্তরাত্মার সৃষ্টি তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না, বিশ্বের সহিত আমার যে প্রকৃত সংযোগ তাহা সে সকলের মধ্য দিয়া নহে, তাহা আমার প্রাণের মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে যে সত্য তাহারই মধ্যে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া আমি আমার যে একটা ধর্ম্ম খাড়া করি, জগৎ-রহস্য সম্বন্ধে যে শাস্ত্র রচনা করি তাহা যে আবার আমার প্রাণের ধর্ম্ম প্রাণের তন্ত্র হইতে উচ্চতর হইবে, এমন কোন কথা নাই। অনেক সময়ে এমনও দেখিতে পাই প্রাণেরই মধ্যে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে একটা সমুচ্চের উপলব্ধি, আর বিচার-বুদ্ধিই তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিকৃত করিয়া দিয়াছে। প্রাণের যে সহজাত দৃষ্টি দিয়া জগৎ দেখিয়াছি, তাহাই সত্যতর, তাহাই উদার মহৎ, বুদ্ধির কারুকার্য্যই তাহাকে মলিন বিরূপ করিয়া ফেলিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা প্রায়ই দেখি কবি তাঁহার কাব্যে যখন আপনার প্রাণটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তখনই তিনি পাইয়াছেন, দেখাইয়াছেন খাঁটি জিনিষটি, আর সেই কবিই যখন আপনাকে সমালোচনা করিতে বসিয়া গিয়াছেন, কাব্যরচনা সম্বন্ধে শাস্ত্ররচনা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তখনি তিনি সত্য হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন।

বুদ্ধির ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বদাই তাই মিশিয়া থাকে কেমন একটা মিথ্যাচারের অবাস্তবতার আভাস। সেখানে পাই না সত্য ধর্ম্মের অটুট অব্যর্থতা, অকুণ্ঠিত ঋজুতা। কথায় বস্তুতে সেখানে প্রাণধর্ম্মের

যতখানি পরিত্যাগ করি না কেন, কথায় ভঙ্গিমায় বস্তুর গঠনে সেটুকু কোন প্রকারে বর্ত্তিয়া থাকিবেই। এমনও হয় যে, যে-বস্তুটি প্রাণে নাই ঠিক সেই বস্তুটিই বুদ্ধি অতিমাত্র আঁকড়িয়া ধরে। স্বভাবের এক বিচিত্র প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রাণের তন্ত্রীতে সহসা একটা ভিন্ন সুর বাজিয়া উঠে। কিন্তু কান পাতিয়া শুনিলে আমরা অনুভব করিব সে সুর কেমন তাল কাটিয়া চলিয়াছে—তাহাতে রহিয়াছে একটা বৃথা আড়ম্বর নতুবা তাহা হইতেছে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। মানুষ বুদ্ধির ধর্ম্ম দিয়া যাহাই ধরিতে চাহে না কেন, একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে দেখিব তাহার ভাবে ভঙ্গিমায় ইঙ্গিতে প্রাণেরই ধর্ম্ম বাহির হইয়া পড়িতেছে, প্রাণেরই ধর্ম্ম অজ্ঞাতসারে কেমন তাহাকে রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে। মানুষ যাহা হইতে চায় তাহা অপেক্ষাও বলীয়ান হইতেছে মানুষ যাহা হইয়াছে।

২

প্রত্যেক মানুষই এক একটি ভাবের বিগ্রহ। এক একটি মূলভাব যাহা তাহার প্রাণে তাহার ধাতুতে তাহার রক্তের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে তাহাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর সকল ভাব ইহাকেই অনুসরণ করিতেছে, ইহারই ছায়ায় গড়িয়া উঠিতেছে। বীরভাব, তপঃশক্তি, ক্ষাত্রতেজ এইরূপ যাহার প্রাণের

ধর্ম্ম তাহার সকল কথায় ইহারই ব্যঞ্জনা লিপ্ত রহিয়াছে। বিপরীত কথা বলিলেও সেখানে পাইব এই ভাবেরই একটা ইঙ্গিত। আর যে মানুষের মূল প্রকৃতিতে এটি নাই, যেখানে কোমলতারই আধিক্য সেখানে সকল বীরত্ব সকল দর্পের মধ্যেও পাইব এই কোমল ভাবই। শেলী ছিলেন স্বাধীনতার নবী, অত্যাচারের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। বিপ্লবকেও আহ্বান করিতে তাঁহার কিছু ইতস্ততঃতা ছিল না। তবুও শেলী নারীসুলভ মাধুর্য্য ও কোমলতারই প্রতিমূর্ত্তি। বীরত্বের মহিমা তাঁহার বিশেষরূপে জানা থাকিলেও, তাঁহার অধিগত জিনিষটি ছিল কমনীয়তা। Helles অথবা Revolt of Islam-এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে শেলী—প্রকৃত শেলী নাই। প্রকৃত শেলী হইতেছেন তিনি যিনি পান (Pan) দেবতার স্তুতি করিয়াছেন, যিনি স্কাইলার্কের বন্দনা করিয়াছেন, যিনি গাহিয়াছেন প্রেমের তত্ত্ব (Love's Philosophy)। শেলী যখন বলিতেছেন—

Arise, arise, arise !
There is blood on the earth that
denies ye bread !

তখন সেখানে তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মাটি তিনি ধরিয়া দেন নাই। কিন্তু যখন তিনি বলিতেছেন—

Like a cloud big with a May shower,
My soul weeps healing rain
On thee, thou withered flower—

অথবা—

> The desire of the moth for the star,
> Of the night for the morrow,
> The devotion to something afar
> From the sphere of our sorrow—

তখন তাঁহার প্রাণের সমস্ত নিগূঢ়তম রহস্যটিই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে আমরা বোধ করি। শেলীর সহিত তুলনা করুন বায়রণ। বায়রণও ছিলেন স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্যের উপাসক— আর সেই জন্যই উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যভাব স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দুইজনের মধ্যে কি প্রভেদ? বায়রণ ছিলেন শক্তির বীর্য্যের বরপুত্র—তাঁহার কথার ভঙ্গিমায় কি এক তপঃশক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে। তিনি যখন বলিতেছেন—

> The Assyrian came down like a wolf
> on the fold—

অথবা—

> Jehova's vessels hold
> The godless heathen's wine!

তখন যে সুর আমাদের শ্রবণে প্রতিধ্বনিত হয় তাহার তুলনা শেলীতে কিছু নাই, তখনই আমাদের সম্যক বোধগম্য হয় প্রকৃত বীরভাব জিনিষটি কি। এই সঙ্গে আর-একজন স্বাধীনতার মুক্তির উপাসকের কথা মনে পড়িতেছে। তিনি শক্তিকে বীরত্বকে তাঁহার ধর্ম্মতন্ত্র হইতে বর্জ্জন করেন নাই। তিনি শেলীর মত

অতিমাত্র নারীপ্রকৃতি ছিলেন না, তাঁহার স্বভাবে পুরুষোচিত একটা সামর্থ্য ধৈর্য্য স্থৈর্য্যের ইঙ্গিত পাই। তবু কিন্তু বায়রণ হইতে তাঁহারও কতখানি প্রভেদ। আমরা বলিতেছি মহাকবি ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের কথা। যে Wordsworthএর মুখ হইতে, আমরা শুনি বাহির হইয়াছে—

—Liberty shall soon, indignant raise
Red on the hills his beacon's comet blaze

—যিনি ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে প্রথমে দেখিয়াছিলেন মুক্তি, তিনিই পরে সে বিপ্লবের ঘোর বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সহিত আর সহানুভূতি করিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রাণ রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যের তালে আর তরঙ্গায়িত হইতে চাহিল না। বস্তুতঃ বায়রণের মত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চণ্ড ক্ষাত্র প্রকৃতি ছিল না। তাঁহার মধ্যে প্রধান ছিল ব্রাহ্মণ্যভাব। তাঁহার কাব্য সৃষ্টির মূল উৎস হইতেছে শান্তভাব, জগতের জীবনের সকল চাঞ্চল্য বৈপরীত্যের অন্তরালে রহিয়াছে যে একটা নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপবৎ স্থির স্নিগ্ধ সত্তা। শক্তির বীর্য্যের আবেগ তাঁহার প্রাণে তেমন সত্য তেমন বাস্তব হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার প্রাণের ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে যখন তিনি বলিতেছেন—

The broad sun
Is sinking down in his tranquillity ;
The gentleness of heaven is on the sea—

আর আমাদের রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা

যাইতে পারে। তাঁহার ধাতুতে বজ্রকঠোর কিছুই নাই, সবই মৃদূনি কুসুমাদপি। তিনি বীরভাবের কথা অনেক বলিয়াছেন, কিন্তু সেখানে তাঁহার অন্তরাত্মাটি কেমন সঙ্কোচে সন্তর্পণে ধরা দিতেছে, এই যেমন—

কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুই জনা দুই জনে—

এখানে বীরত্বের শত মালসাট সত্ত্বেও আমাদের প্রাণ তপ্ত হইয়া উঠে না। আর, এই সাথে শুনুন দেখি মধুসূদনের সেই—

রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী—

এখানে আস্ফালন আক্রন্দন কিছু নাই অথচ যে বীরভাবের নমুনা আমরা পাই তাহা কি গভীর কি উদাত্ত, কি সামর্থ্যে ভরাট—তাহা যে সম্পূর্ণ আর-এক ধরণের, আর-একটি লোকের। মধুসূদনে বীরভাব ক্ষাত্রশক্তি একেবারে মজ্জাগত উপলব্ধির প্রাণের বস্তু, রবীন্দ্রনাথে তাহা অধিকাংশ স্থলেই ক্ষণিকের বিলাস মাত্র—বুদ্ধির কল্পনার খেলা।

প্রবর্ত্তক
ফাল্গুন, ১৩২৮

ট্রাজেডির কথা

মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং—উপনিষদের দেবতার মত ট্র্যাজেডিও তাহার আনন্দকে জমাইয়া তুলিয়াছে মৃত্যুর অভিসিঞ্চনে। মৃত্যুর রসেই ট্রাজেডির পাক। সুখ যেখানে দুঃখের পূর্ব্বাভাস, মিলন যেখানে আশু বিয়োগে পরিণত হইতেছে, প্রতিষ্ঠা যেখানে বিসর্জ্জনেরই হাত ধরিয়া চলিয়াছে, সেখানেই ট্রাজেডির মাধুর্য্য দেখা দিয়াছে। ট্রাজেডির মাধুর্য্য এত মধুর, কারণ তাহা এত তীব্র, এত উগ্র ; এত তীব্র, এত উগ্র, কারণ অমৃতকে এখানে মৃত্যুর ভাণ্ডে বাঁটিয়া দেওয়া হইতেছে। সকল আয়োজনের পুরোভাগে একটা সব-শেষের দাঁড়ি যেন কোথা হইতে টানিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহারই উপর প্রতিহত হইয়া যেন সে আয়োজনের রস উদ্বেল উচ্ছল ফেনিল হইয়া ফিরিয়া দেখা দিয়াছে। ক্ষণিকার, কণিকার বন্ধনীর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, তাই সে

রস এমন নিবিড় চঞ্চল আবিল হইয়া উঠিয়াছে। ফুটনোন্মুখ ফুলের কুঁড়িটির এত মাধুর্য্য কোথায়? আশু পূর্ণবিকাশের সার্থকতা অব্যবহিত পরেই শুকাইয়া ঝরিয়া-পড়ার নিরর্থকতার মধ্যে হারাইয়া যাইতেছে। অন্তরাত্মায় এই হারাইয়া ফেলিবার পূর্ব্বানুভূতি বর্ত্তমান আনন্দকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিতেছে, তাহাকে এমন জমাট করিয়া তুলিতেছে। বিচ্ছেদের কালো পরিসীমার মধ্যে এই মুহূর্ত্তের তৃপ্তি এমন গাঢ় উজ্জ্বল প্রখর হইয়া দেখা দিয়াছে। অমৃত আছে, কিন্তু তাহা দেখা দিতেছে মৃত্যুর ফাঁকে ফাঁকে, তাই সে অমৃতে এত মাদকতা, তাই সে মৃত্যুও অমৃতেরই তুল্য।

এই যে জগৎ—মৃত্যুই যেখানে অমৃতের ভিয়ান দিতেছে—তাহা হইতেছে প্রাণময় জগৎ, তাহারই নাম কামলোক। প্রাণাত্মক জগৎ হইতেছে প্রাণশক্তির লীলাক্ষেত্র—ভোগের, বাসনার, কামনার যত শক্তি তাহারাই এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এই কামলোকের ধর্ম্মই হইতেছে, বেদনার মধ্য দিয়া তৃপ্তি, অতৃপ্তির মধ্যেই তীব্রানন্দ। কোন প্রাণী সম্বন্ধে কথিত আছে যে সন্তানকে জন্ম দিয়া সে নিজেও প্রাণত্যাগ করে—সন্তানকে আপন গর্ভে ধারণ করিবার, তাহাকে আপন শরীর হইতে সৃষ্টি করিয়া দিবার যে উগ্র আনন্দ তাহার মূল্য হইতেছে জীবন দান, মৃত্যু। শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও আছে একটা উৎকট আনন্দ, পীড়া বা কষ্টভোগের মধ্যেই লুকান আছে একটা বিপরীত ভোগ। এ যেন সেই জন্তুর মত, যাহার অদ্ভুত টান এক রকম কণ্টকাকীর্ণ

লতার উপরে, একবার তাহা চিবাইতে আরম্ভ করিলে, সে লতার রসে জিহ্বা একবার লালায়িত হইয়া উঠিলে আর তাহাকে সে ছাড়িতে পারে না, জিহ্বা মুখ কাটিয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে, ঝর ঝর রক্ত পড়িতেছে, তবুও কি এক নেশার ভরে, উৎকট আনন্দে অনবরত চিবাইতে থাকিবেই। সকল রকম দুঃখই একটা সুখের বিকৃতি, উল্টা দিক—সে দুঃখের মাত্রা যত বেশী, তাহার মধ্যে সুখেরও আবেশ তত নিবিড়। প্রাণাবেগের স্রোত চলিয়াছে যেন পাকের পর পাক দিয়া, আবর্ত্তের গণ্ডী কাটিয়া কাটিয়া, তাই প্রত্যেক পাক প্রত্যেক গণ্ডীর মধ্যে একটা ভোগানন্দ অত্যুগ্র টানের ফলে উচ্ছ্বসিত ফেনায়িত হইয়া উঠিতেছে। এই অত্যুগ্র টানেরই অন্য নাম বেদনা এবং এই বেদনাই আনন্দের একটা বিশেষরূপ তৈয়ার করিয়া ধরিতেছে।

কামনার বুভুক্ষার, অর্থই শেষ বা মৃত্যু—অশনায়া হি মৃত্যুঃ। কামনার, বুভুক্ষার জগতের যে ছন্দশক্তি তাহাই মৃত্যু। মৃত্যুই সে জগতের গতিতে তাল রাখিতেছে, পদে পদে যতি টানিয়া দিতেছে। বিচ্ছেদ ছাড়া সেখানে মিলন নাই। মৃত্যুর যে পরমাণু-সংগ্রহ তাহারই অন্য নাম কামনা। কামানন্দের গড়নের মধ্যেই তাই রহিয়াছে বিয়োগের, ধ্বংসের বীজ। কামী প্রাণ—প্রাণশক্তি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে যাহার মধ্যে, সেই অতিমানুষের ধর্ম্ম নীট্শ (Nietzsche) নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাই সঙ্কুল বিপদের মধ্যে থাকিয়া জীবন যাত্রা—to live dangerously. তাহা যদি না হইত, মৃত্যু যদি না থাকিত, জীবনে যদি ছেদ না

থাকিত, সেই একটানা আনন্দ কি তবে নীরস হইয়া পড়িত না? যেখানে হারাইয়া ফেলিবার আশঙ্কা নাই, সেখানে আঁকড়িয়া ধরিবার তাড়াও নাই, সুতরাং সেখানকার উপভোগে তীব্রতা নাই, বৈচিত্র্য নাই। যে জলে তুফান নাই, জোয়ার-ভাটাও নাই, উঠা-নামা নাই—এ সকলের সম্ভাবনাও নাই সেখানে কোন প্রাণের বিলাস জমিয়া উঠিতে পারে? ফলতঃ, এই কামলোক হইতেছে রাক্ষসের, অসুরের জগৎ। রাক্ষসের, অসুরের অব্যর্থ পরিণাম একটা দারুণ, বীভৎস মৃত্যু। কিন্তু এই মৃত্যুর উপরই প্রতিষ্ঠিত তাহার জীবনের ভোগ।

এই কামলোকের, এই মৃত্যুর জগতের চিত্র দিতেছে ট্রাজেডি। সাধারণ মানুষ এই কামলোকের, এই মৃত্যুর জগতেরই অধিবাসী, 'অশনা'র সত্যই মানুষের প্রাণের সত্য—তাই যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের প্রতিনিধি হইয়া কবি-শিল্পী ট্রাজেডি রচনা করিয়াছে, ট্রাজেডির মধ্যে মানুষ চিরদিন আস্বাদন করিয়া চলিয়াছে একটা অপরূপ আনন্দ। মানুষের অন্তরাত্মা এই কামলোকের সহিত এতখানি জড়িত মিলিত, এই কামলোকের সত্যই তাহার জীবনের এত নিবিড় অন্তরঙ্গ কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাই ট্রাজেডিরই মধ্যে সে দেখিতে পায় যেন তাহার মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি, তাহার নিগূঢ়তম রহস্যের মূর্ত্ত প্রতিকৃতি। ট্রাজেডি তাহার এত অন্তরের সত্য, তাই সে বস্তু এমন প্রাণকাড়া, মনকাড়া, এমন সুন্দর। তাই সকলের ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া কবি বলিতেছেন—Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts.

২

ইংলণ্ডের কবি শেক্স্‌পীয়রের ট্রাজেডিতে এই কামলোক, এই প্রাণাত্মিকা প্রকৃতি মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেক্স্‌পীয়রের এক একটি মানুষ যেন মৌলিক—আদি ও আদিম—প্রাণাবেগের বিগ্রহ। আর যে জগৎ হইতে এই সকল মানুষকে শেক্সপীয়র তুলিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন তাহাও মনে হয় যেন ঐ রকমই একটা ঘোর প্রাকৃত প্রকৃতির দেশ—উপনিষদ যাহাকে বলিয়াছেন "অন্ধং তমঃ", সেই রকমই একটা তামস-রাজ্য। 'রাজা লিয়র', 'ম্যাকবেথ', 'ওথেলো', এমন কি 'হ্যামলেট' পর্য্যন্ত, কোনটিই আধুনিক সমাজের, সভ্য জগতের, শিক্ষিত দীক্ষিত মানুষের কথা নয়। কোন্ তামস যুগের, কোন্ পুরাতন জগতের কোণে কোণে কোথায় ছিল যে একটা আদিম সমাজ তাহাই হইতেছে এই সকল নাট্যের রঙ্গভূমি। এই রকম পটের আশ্রয় শেক্স্‌পীয়র যেন ইচ্ছা করিয়া বাছিয়া বাছিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কামলোকের—মৃত্যুর জগতে সত্যকে ফলাইয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে। লিয়র, ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট প্রত্যেকেই এক একটা তামসশক্তির যমরাজার হাতের ক্রীড়নক। আর এই ঘন তমোরাশির অভ্যন্তরে যে আলোরেখা নিহিত, এই মৃত্যুর ফাঁকে ফাঁকে যে অমৃতের ধারা প্রবাহিত তাহারই প্রতীক যেন ঐ করুণ-মধুর কর্ডেলিয়া, (ক্রেয়াজ ?), ডেস্‌ডিমোনা, ওফেলিয়া।

ট্রাজেডির আরএক রূপ আমরা দেখি গ্রীক সাহিত্যে। ইংরাজ জাতি—বিশেষতঃ এলিজাবেথের সময়ের ইংরাজ জাতি, যে নিছক প্রাণশক্তিরই প্রতিমূর্ত্তি তাহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাহিরের জীবনে একটা বিপুল কর্ম্মৈষণা, ভোগৈষণা এ যুগে জাতিটিকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল। তাহারই ফলে কত লোক সমুদ্র পাড়ি দিল, দেশ দেশান্তরে ছুটিয়া চলিল, কত রোমান্স সৃষ্টি করিল। এই তীব্র জীবনীশক্তির যে রস-লীলা সাহিত্যে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে শেক্স্পীয়রের ট্রাজেডিতে। প্রাণশক্তির, কামলোকের যে লীলা তাহা মানুষের আদি ও অকৃত্রিম প্রকৃতির লীলা—শেক্স্পীয়র তাহারই সত্য ও সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু গ্রীক প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রকমের। একটা সুদৃঢ় চিন্তাশক্তি, একটা মার্জ্জিত বুদ্ধি গ্রীকের চিত্তকে শীলবান করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার প্রাণশক্তির মধ্যে একটা সংযম ও প্রসাদগুণ আনিয়া দিয়াছিল। গ্রীকো-লাতিন শিক্ষা-দীক্ষায় পরিপুষ্ট ফরাসীর কাছে তাই শেক্স্পীয়র অতিমাত্র উগ্র ও রুক্ষ বলিয়া বোধ হয়।—ভলতেয়ার (Voltaire) তাই barbarous Shakespeare, অসভ্য শেক্স্পীয়র বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। গ্রীক ট্রাজেডিতে প্রাকৃত মানুষের নগ্ন প্রকৃতির অবাধ উত্তাল খেলা খুলিয়া দেখান হয় নাই—তাহার সাথে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে মানুষের উচ্চতর প্রকৃতির একটা সুর, আদর্শ-প্রিয়তার একটা রেশ। এস্‌কিল'এর প্রমাথী অথবা সফোকলা'র আন্তিগোণীতে ট্রাজেডি ফুটিয়া উঠিয়াছে কামনার সহিত কামনার সংঘর্ষে নয়, কিন্তু আদর্শের সহিত কামনার সংঘর্ষে—অর্থাৎ

প্রাণাবেগের সহিত প্রাণাবেগের সংঘাতে নয় কিন্তু প্রাণাবেগের সহিত মনোবেগের সংঘাতে। এমনকি ইউরিপিদ'এর মিদিয়া যতই বিপুল প্রাণাবেগের উচ্ছ্বাসে—ঈর্ষা, পাশব নিষ্ঠুরতায় ভরপূর থাকুক না কেন, তবুও তাহারই মধ্যে লুক্কায়িত আছে একটা অপরূপ মাতৃস্নেহের ধারা (সে মাতৃস্নেহ প্রকট যদিও একটা ক্রূরতার, বীভৎসতার রূপে)। বাহ্য ঘটনার দিক দিয়া যাহাই হোক না কেন, গ্রীক ট্রাজেডির ভঙ্গীর মধ্যে পাই অন্ততঃ চিন্তা-শক্তির, বুদ্ধিবৃত্তির, শীলতার, প্রসাদগুণের পিছন টান। কিন্তু তবুও মার্জ্জিত মনন, উন্নত মস্তিষ্ক মোটের উপরে কখনও মানুষের কামধর্ম্মকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না ; বড় জোর তাহাকে দেখায় একটা নূতন ক্ষেত্রে বা ভঙ্গীতে, তাহার সাথে যোগ করিয়া দেয় মানুষের উপরের স্তরের একটা প্রতিধ্বনি, একটা ক্ষীণ রশ্মি। আর ইহাতে ট্রাজেডির স্বরূপ কিছু বদলায় না, রূপ বা ভেল যদিই বা কিছু বদলায়। মনের টান সব এখানে প্রাণের বুভুক্ষারই কেবল খোরাক জোগায়। যমরাজা এখানে এক পা রাখিয়াছেন প্রাণের জগতে, আর-এক পা রাখিয়াছেন মনের জগতে, এবং উভয় জগৎই নিজের কবলে গ্রাস করিয়াছেন। গ্রীক ট্রাজেডি তাই কম ট্রাজিক নয়—কামলোকের মৃত্যুর জগতের যে লক্ষণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি তাহা কিছু তীব্রভাবে এখানে দেখা দেয় নাই। মার্জ্জিত মনের এমন শক্তি নাই যে প্রাণশক্তির অব্যর্থ পরিণামকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে।

ইহা সম্ভব কেবল তখনই যখন মানুষ আরও উপরে উঠিয়া

যায় এমন একটা স্থিতি, অন্তরাত্মার এমন একটা স্বভাব, যেখানে অন্নের, খণ্ডের দৃষ্টি ও অনুভূতি নাই, আছে সমগ্রের বৃহতের শান্তনিবিড় দৃষ্টি ও অনুভূতি। সীমা সেখানে সসীম হইয়া আর দেখা দেয় না কিন্তু আবির্ভূত হয় একটা পূর্ণতারই অঙ্গীভূত হইয়া। মুহূর্ত্ত আর সেখানে শাশ্বতকে কাটিয়া কাটিয়া ধরে না, শাশ্বতেরই মধ্যে তাহা যায় মিলিয়া মিশিয়া। বর্ত্তমানের অনুভূতি সেখানে একান্ত বর্ত্তমানেই আবদ্ধ থাকে না, তাহা থাকে তিনকাল—এমন কি হয়ত কালাতিরিক্ত কিছুকে ব্যাপিয়া। তাই বাসনা প্রাণের টানা স্রোতের মধ্যে গণ্ডী টানিয়া টানিয়া দুঃখের বেদনার ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করে না, করিলেও ইহাদিগকে কাটাইয়া অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। কামনা শুধু মৃত্যুতেই পর্য্যবসিত হয় না। ট্রাজেডির অনুভূতি তাই আর ফলিয়া উঠিতে পারে না।

প্রাচীন ভারত অন্তরাত্মার এই রকম একটা ব্রাহ্মীস্থিতি পাইয়াছিল। তাহার জীবন প্রাণময় কোষেই একান্ত আবদ্ধ ছিল না—এমন কি মনকেও সে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তাহার সত্তার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা ছিল আর-একটা সমুচ্চ লোকে। ভারতের ঋষিগণ যে বৃহৎ সত্যকে অধিগত করিয়াছিলেন, তাহাই ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার মূলে, তাঁহাদের ছিল যে একটা বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টি তাহারই ছাপ, তাহারই রেশ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে পরবর্ত্তী সকল কবিদিগেরই সৃষ্টির মধ্যে। ঋষিরা—আদি কবিরা—তাঁহাদের সেই সমুচ্চলোকের সমুচ্চধর্ম্মের সহায়ে প্রাণ-মনকে—অজ্ঞানের কামনার খেলাকে একটা পূর্ণতর অভিজ্ঞতার

মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, মৃত্যুকে দিয়া অমৃতের দুয়ারেই গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন—মৃত্যুং তীর্ত্বা অমৃতং অশ্নুতে। এই ধাতের জন্যই নিছক ট্রাজেডি ভারতে জন্মগ্রহণ করে নাই। কামলোকের বুভুক্ষার পরিবর্তে ভারতের অন্তরাত্মা পাইয়াছিল চিন্ময়লোকের আনন্দ। বুভুক্ষার প্রয়াস হইতেছে এই অনন্ত আনন্দকে ক্ষুদ্রের ক্ষণিকের মধ্যে ভরিয়া বাঁধিয়া রাখা। তাই সে আনন্দ ঘোলা হইয়া কটু হইয়া উঠে এবং এই ঘোলা কটু আনন্দই ট্রাজেডির রস।

পশ্চাত্যের এক মহামনীষী (আরিস্ততল) অবশ্য বলিতেছেন যে ট্রাজেডির শক্তি এই যে, তাহার রসভোগে কামনার আবেগ বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। একটা বিপুল দুঃখের কাহিনী শ্রোতার হৃদয়ে জাগাইয়া ধরে সহানুভূতি, করুণা, নিবিড় উদার এক সরসতা। মনের মধ্যে, কল্পনায় আমাদের কামনার তৃপ্তি ঘটাইয়া বাস্তব কামনার বেগকে সংযত ও শীলবান করিয়া তোলে। কিন্তু এরূপ করিলেও, ট্রাজেডি যে হৃদয়ে একটা বেদনার, একটা শেষ নিশ্বাসের রেশ রাখিয়া যায় তাও কামলোকেরই কথা ; অন্তরাত্মা সেখানে মৃত্যুর মধ্যে অমৃতত্বের খোঁজ পাইলেও, মৃত্যুর ওপারে বিশুদ্ধ অমৃতত্বের খোঁজ পায় না। ট্রাজেডি হইতেছে মানসলোকে অমৃতের ভোগ, কিন্তু অমৃতের লোকে অমৃতের ভোগ আর এক জিনিষ।

ট্রাজেডির আছে একটা সত্য, একটা সৌন্দর্য্য, একটা আনন্দই। শেক্স্পীয়র ইহার পূর্ণস্বরূপ দেখাইয়াছেন, সোফো-কলাও ইহাকেই তাঁহার জগতের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু ভারত ইহাকে একান্ত করিয়া ধরিতে পারে নাই। ভারতের প্রাণশক্তি একটা আধ্যাত্মিক পূর্ণতার আনন্দে বিধৃত ছিল, তাই ট্রাজেডি সেখানে "কমেদিয়া"-রই (Comœdia), বিচ্ছেদ মিলনেরই একটা ইতিমধ্যেকার অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছিল। ভারতের কাব্যে করুণ রস দরকার হইয়াছিল পরিণামে হাসির মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্ম। কারণ ভারত সত্য সত্যই বুঝিয়াছিল যে—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যতদূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথাও বিচ্ছেদ নাই।

ইউরোপীয় কবির কবিত্বের উৎস saddest thoughts, sweet melancholy হইতে পারে, কারণ ইউরোপের কবি প্রাণময় স্তরের স্রষ্টা ও ভোক্তা। ভারতীয় কবির কবিত্বের উৎস হইতেছে, বৈদিক ঋষির কথায় 'সুনৃত' অর্থাৎ হ্লাদকর সত্য। ফলতঃ বৈদিক ঋষি, উপনিষদের ঋষি অন্তরাত্মার যে পূর্ণ আনন্দ ও হাস্য লইয়া অপরূপ কবিতা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার তুলনা কোথাও মিলে না। প্রাণময় স্তরের হাসি হইতেছে কান্নারই ভেল, রকমফের। তাই কান্নার সঙ্গীত এত মধুর, এত তীব্র, কারণ মানুষের অন্তরের পুরুষ স্বভাবতই এই প্রাণময় স্তরের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ঋষি-কবিরা এমন একটা স্তরে উঠিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে এমন জীবন্তভাবে অনুভব করিয়াছিলেন ও প্রাণের

ভোগকে পর্য্যন্ত সেই রঙে রঙাইতে পারিয়াছিলেন যে সেখানে বিশুদ্ধ আনন্দ, হর্ষই চরম সত্যবোধের, সুতরাং পরম কবিত্বের সুর দিয়া দিয়াছে—

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধী—

—যেখানে রহিয়াছে সকল আনন্দ, সকল মোদ আমোদ প্রমোদ—যেখানে সকল কামনার কামনা পরিতৃপ্ত সেইখানে লইয়া গিয়া আমাকে অমৃতময় করিয়া ধর।

বঙ্গবাণী
অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

অশ্লীল ও অসুন্দর—রূপ ও রস

১

শিল্পে অশ্লীলের স্থান আছে, কিন্তু অসুন্দরের স্থান নাই।

অশ্লীল ও অসুন্দর এক জিনিষ নয়—শ্লীল আর সুন্দরও এক জিনিষ নয়।

মানুষের মধ্যে যে পশু আছে, তাহাকে রাখিয়া-ঢাকিয়া চলা সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ; ইহারই নাম শ্লীলতা। আর এই পশুকে বে-আবরু করিয়া ধরার নামই অশ্লীলতা।

সভ্য সমাজেও কোথাও কোন ক্ষেত্রে পশুকে বে-আবরু করিয়া ধরিবার প্রয়োজন বা সার্থকতা আদৌ আছে কি?

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার এই অধিকার আছে, বলা যায়—

কিন্তু শিল্পীর আছে কি? সৌন্দর্য্য-রচনার দিক দিয়া অশ্লীলতা কোন্ উপকরণের যোগান দিতেছে?

* *

*

পশুকে বে-আবরু করা, কথার কথা, নয় কি? কারণ, সেই বে-আবরু যে কিসে হয় আর কিসে হয় না, তাহা লইয়া দেশে দেশে কালে কালে বিস্তর মতান্তর ও মনান্তর রহিয়াছে।

শ্লীলতা হইতেছে আচারগত ভব্যতা, সমাজে চলিত নিয়ম নিষ্ঠা। যাহা সামাজিক সংস্কার মাত্র, সমাজ হিসাবে তাহার ব্যতিক্রম হইবেই। শ্লীল অশ্লীল আপেক্ষিক জিনিষ, তাহা নিত্য কিছু নয়।

শিল্পী অশ্লীল হইতে পারেন অর্থাৎ সামাজিক একটা সংস্কারকে, বিশেষ দেশের বিশেষ কালে প্রযুক্ত একটা ব্যবস্থাকে, সমাজপতি যেমন সনাতন সত্য বলিয়া দেখেন তেমন না দেখিয়া, নেহাৎ আপেক্ষিক সত্যরূপেই দেখিতে পারেন, তাহার বিপরীত ব্যবস্থার মধ্যেও যে সত্য থাকিতে পারে তাহা দেখাইতে পারেন; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে অসুন্দর হইয়া পড়িবেন, এমন কথা নাই।

* *

*

যাহা শ্লীল তাহা ভব্য, তাহা সুষ্ঠু (correct) হইতে পারে; কিন্তু এই হেতুই তাহাকে যে আবার সুন্দর বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা সঙ্গত নয়।

পিউরিটানেরা (Puritans) সুষ্ঠুর ভব্যের শ্লীলের প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু সেই জন্য তাহাদের মধ্যে সুন্দরও যে আসিয়া ধরা দিয়াছে এমন প্রমাণ পাই না। ইতিহাস বলিতেছে উল্টা কথা—শ্লীলতাও যে অসুন্দরেরই বিগ্রহ হইতে পারে তাহার উদাহরণ পিউরিটান ইংলণ্ড।

আর অশ্লীল যে অসুন্দর হইবেই, এ কথা কত বড় মিথ্যা তাহার জাগ্রত প্রমাণ মহাকবি কালিদাস।

* *

*

অশ্লীল অসুন্দর হইয়া পড়ে কখন? বে-আবরুতার একটা বিশেষ ধাপে নামিয়া আসিলে? আমি তা মনে করি না। অশ্লীলের সাথে বে-আবরুতার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু অসুন্দরের সাথে নয়। চরম বে-আবরুতাও পরম সুন্দর হইতে পারে—দ্রষ্টার দেখার ভঙ্গীতে, শিল্পীর হাতের গুণে। আমি মনে করি অশ্লীল অসুন্দর হয় ঠিক সেই কারণেই যে কারণে শ্লীলও অসুন্দর হইয়া পড়ে।

শ্লীলতা অসুন্দর যখন শ্লীলতার অর্থ ছুঁৎ-ধর্ম্ম, রুচিবাগীশতা, "উন্নাসিকতা" (prudishness)—অর্থাৎ বস্তুকে যখন তাহার সহজ স্বাভাবিক মর্য্যাদা দেই না, বিশ্বলীলায় তাহার যে ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহা উপলব্ধি না করিয়া, সমগ্রের মধ্যে তাহার স্বস্থান হইতে কাটিয়া তুলিয়া আলাদা করিয়া দেখি, একটা কৃত্রিম মূল্য—কখনও অত্যধিক, কখনও অতি ন্যূন—তাহার উপর আরোপ করি।

জিনিষ সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে যখন তাহাতে ধরা দেয় বিশ্ব-ছন্দের দোল, সৃষ্টির মহানন্দের একখানি হাসি। স্বভাবের বুকে সবই সুন্দর, অসুন্দর হইতেছে যাহা কৃত্রিম, যাহা কুটিল (perverse)।

শ্লীলতা অসুন্দর যখন তাহা কেবল বাহ্য ধোপ-দুরস্ত শুচিতা, যখন তাহা অন্তরের কোন সত্যের অভিব্যক্তি নয়। শুধু অসুন্দর কেন, শরীরটাকে সামলাইয়া ধরিবার অতিমাত্র চেষ্টায়, শ্লীলতা সময়ে সময়ে প্রায় অশ্লীলই হইয়া উঠে।

অন্তরের চিন্ময় আনন্দে যাহা উপলব্ধ সত্য নয়, তাহাকে যখন জোর করিয়া সত্য বলিয়া সাজাইতে বসি, তখনই অসুন্দরের সৃষ্টি—তাহা শ্লীলই হোক, অশ্লীলই হোক।

*

*

কুৎসিতকে, ক্লেদকে যে আনন্দে ভরপুর হইয়া ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, হে শিল্পী, তুমি অনুভব করিয়াছ কি সেই আনন্দ—তোমার সৃষ্টির পিছনে আছে সেই আনন্দ, সেই আনন্দের নিরিখ? তবেই তুমি সেই পরশ-পাথর পাইয়াছ অসুন্দরকেও যাহা সুন্দর করিয়া তোলে।

দুঃশাসনের হাতে আবরু-হরণ অশ্লীল এবং অসুন্দর ; শ্রীকৃষ্ণের হাতে আবরু-হরণ শ্লীল না হোক, পরম সুন্দর।

কবি বলিতেছেন, "অতি-সুন্দরের সাথে জুড়িয়া দাও

ভগবানকে, পাইবে অতি-সুন্দর। ফাঁসিকাঠে ভগবানকে যখন ঝুলাইয়া দিয়াছ তখনই তাহা হইয়া উঠিয়াছে 'ক্রশ'।"

কালি-কলম

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

২

সৌন্দর্য্য দুই রকমের—এক রূপের আর-এক রসের। যৌবন সুন্দর, কারণ সে রূপবান। জরাও সুন্দর, কারণ সে রসময়। স্বর্গের সৌন্দর্য্য রূপে—শ্রুতি বলিতেছে, "কবিঃ কবিত্বা দিবি রূপমাসজৎ" (ঋগ্বেদ); পৃথিবীর সৌন্দর্য্য রসে—এখানেও শ্রৌত প্রমাণ, 'এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ' (বৃহদারণ্যক)। হাসির সৌন্দর্য্য রূপে, অশ্রুর সৌন্দর্য্য রসে। সুখের সৌন্দর্য্য রূপে, দুঃখের সৌন্দর্য্য রসে। কমেডি রূপে সুন্দর, ট্রাজেডি সুন্দর রসে। 'এরিয়েল' (Ariel) রূপবান, তাই সুন্দর ; কালিবান (Caliban) রসময়, তাই সুন্দর। শকুন্তলা সুন্দর, কারণ সে রূপের বিগ্রহ ; লেডি ম্যাকবেথ সুন্দর, কারণ সে রসের মূর্ত্তি।

কবি কালিদাস রূপের সৌন্দর্য্য চরম করিয়া দেখাইয়াছেন ; আর রসের সৌন্দর্য্য জমিয়া উঠিয়াছে শেক্স্‌পীয়রে। পেত্রার্কা ছিলেন রূপের পসারী, রূপের উপর রূপ সাজাইয়া তিনি সুন্দরকে

* "Attachez Dieu au gibet, vous avez la croix,"
—Victor Hugo

গড়িয়াছেন ; কিন্তু দান্তের সৌন্দর্য্যে পাই রসেরই ভিয়ান। আমাদের বিদ্যাপতি ঠাকুর রূপ রূপ করিয়া পাগল হইয়াছিলেন, তাঁহার ব্যথা—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

আর চণ্ডীদাস বড়ু—

রসে ডুবু ডুবু রসের পরাণ,

তাঁহার আকুতি—

রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি।

* * *

তাই বলিয়া রূপের মধ্যে রস থাকিতে নাই বা রসের মধ্যে রূপ থাকিতে নাই, এমন নয়। ফলতঃ যে রূপে রসের অভাব তাহা প্রাণহীন কাঠাম মাত্র, তাহার সৌন্দর্য্য জ্যামিতির ক্ষেত্রগত রেখা-সঙ্গতি অথবা ব্যাকরণের সূত্রগত শৃঙ্খলা ; রূপ আরও সুরূপ হইয়া উঠে, ভিতরে রসের সঞ্চারে—এই রসের সঞ্চারই অন্য কথায় জিনিষের "লাবণ্য"। পক্ষান্তরে রসও নিবিড় হইয়া উঠে, রস-ঘন হইয়া উঠে রূপের বাঁধনে।

এই হিসাবে রূপ ও রস একান্ত পৃথক জিনিষ নয়। একই সৌন্দর্য্যের তাহারা এপিঠ আর ওপিঠ। রূপ দিতেছে দেহ, রস দিতেছে প্রাণ ; রূপ আকৃতি, আর রস প্রকৃতি। রস হইতেছে

বস্তুর সত্তাগত অন্তর্নিহিত আনন্দ; কি ভাবে আছি, কি জন্য আছি তাহার উপর যে আনন্দ নির্ভর করিতেছে না—যে ভাবেই থাকি, যে জন্যই থাকি তাহাতেই যে তৃপ্তি, শুধু "আছি" বলিয়াই হৃদ্‌পুরুষের যে অহেতুক সুখ, ইহারই নাম রস। আর রূপ হইতেছে এই আনন্দকে ধরিয়া রাখিবার, বাহিরে ফুটাইয়া গোচর করিয়া ধরিবার জন্য সুগঠিত পাত্র, সুঠাম কাঠাম। রসের নৈসর্গিক ধর্ম্ম আপনাকে যথেচ্ছ উৎসারিত প্লাবিত করিয়া দেওয়া—কোথা হইতে আসিতেছে, কি ভাবে কোন্ দিকে চলিয়াছে, সে দিকে নজর দিবার প্রয়োজন তাহার নাই। রসের উল্লাসে কোন বাধা কোন নিয়ম নাই—তাহা নিরঙ্কুশ। রস সর্ব্বত্র, সর্ব্বগামী। ভীমেও রস, কান্তেও রস; তাই মাধুর্য্যেও রস, বীভৎসেও রস; তাই বাস্তবেও রস, স্বপ্নেও রস; তাই পাপেও রস, পুণ্যেও রস; তাই মন্দাকিনীও রসের আধার, ভোগবতীও রসের আধার।

এই যে স্বাধীন "স্বতন্তরী" রস তাহাকে বাঁধিয়াছে রূপ; রস বাঁধনহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাহাতে অসুন্দর হইয়া না পড়ে সেই জন্য পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে রূপ। আপনা-আপনি রস হইতেছে অরাজক, রূপ হইতেছে বিধি, ধর্ম্ম। রস ব্যয়, রূপ সঞ্চয়, রূপ স্থিতি, রস গতি।

(৩)

দেশে দেশে যেমন আর্ট আছে, তেমনি আর্ট আছে লোকে লোকে। দেশ অর্থ পৃথিবীর এক একটি ভাগ, লোক অর্থ চেতনার এক একটি স্তর। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের আর্ট আছে, তেমনি আর্ট আছে অধঃ ও ঊর্দ্ধের, অপরা ও পরা ভূমির। যেমন ভারতের চীনের গ্রীসের ফরাসীর ইংরাজের আর্ট আছে, তেমনি পশু পিশাচ যক্ষ রক্ষ অসুর দেবতা—অথবা দেহ প্রাণ মন প্রভৃতি আয়তনের আছে আপন আপন বিশিষ্ট আর্ট। প্রত্যেক দেশের মতনই, প্রত্যেক স্তরের চেতনার সত্য ও ধর্ম্ম আর্টের এক একটি বিশেষ মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেছে।

যে দেশের হোক আর যে লোকেরই হোক আর্ট আর্ট ; অর্থাৎ, বিশেষ একটি দেশের হইলেই আর্ট যে ভাল বা খারাপ হইবে, এমন কোন কথা নাই—ইউরোপের আর্ট হইলেই তাহাকে ভারতের আর্টের উপরে কি নীচে সরাসরি তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা যায় না—সেই রকম সুন্দরের সৃষ্টি চেতনার যে স্তরেই হোক না কেন, পরা-অপরা ঊর্দ্ধ-অধঃ উপর-নীচ যাহা হোক না—তাহাতে আর্ট হিসাবে, সৌন্দর্য্য হিসাবে মর্য্যাদায় ইতর-বিশেষ হয় না। নন্দলাল যে চেতনা লইয়া সৃষ্টি করেন, তাঁহার দৃষ্টি বিচরণ করে যে লোকে তাহা অবনীন্দ্রের জগৎ হইতে উপরে—কিন্তু কেবল আর্ট বা রূপণ হিসাবে নন্দলালের সৃষ্টি অবনীন্দ্রের উপরে যায় না।

ক্ষেত্রের দরুণ, আর্ট হিসাবে আর্টের মর্য্যাদায় কিছু ইতর বিশেষ হয় না, কিন্তু সেই ইতর বিশেষ হয় অন্য হিসাবে—মানুষের মানুষত্ব, জীবন-সাধনা হিসাবে। পুরাণে আছে, রাক্ষসেরা অসুরেরা পর্য্যন্ত তপস্যা করিত, সাধনা করিত। রাক্ষসের তপস্যা আছে, অসুরের তপস্যা আছে, আবার দেবতারও তপস্যা আছে। তপস্যার শক্তি বা প্রভাব অনেক সময়ে দেবতার অপেক্ষা অসুর বা রাক্ষসেরই বেশি হইতে পারে কিন্তু দেবতার তপস্যা তবু সকলের উপরে আসন পায় কেন? তন্ত্রেও বলিয়াছে দেবভাব, বীরভাব, পশুভাবের কথা—সিদ্ধি তিন ভাবেই হইতে পারে; তথাপি তাহাদের স্থান মর্য্যাদা যথাক্রমে হইতেছে উত্তম, মধ্যম ও অধম। গীতার ত্রিগুণ—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃও এই সম্বন্ধে স্মরণ করা যাইতে পারে।

শুধু সৌন্দর্য্য হিসাবে সুন্দর সর্ব্বত্র সমান মূল্যের হইলেও, বস্তু হিসাবে সত্তা হিসাবে হইতে পারে উত্তম মধ্যম অধম। রূপ সুরূপ হইলেও রস হিসাবে তাহা হইতে পারে সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক। সুন্দর পশু, সুন্দর মানুষ, সুন্দর দেবতা একই সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন ছাঁচ বলিয়া যদি ধরা যায়, তবুও অন্তরাত্মার সত্য বা চেতনা বা রসায়ন সর্ব্বত্র সমান পর্য্যায়ের নয়।

রূপ দিতেছে সাম্য, রস দিতেছে উচ্চাবচ ক্রম।

রূপ ও রস, এই দুই লইয়া আর্ট বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। রস হইতেছে বস্তুর অন্তরাত্মার আনন্দ, আবেগ, আহ্লাদ; আর এই রসের সম্যক প্রকাশ হইতেছে রূপ। রস যাহাই হোক না তাহাকে

ফুটাইয়া ধরিতে পারিলেই রূপের সার্থকতা—এ কথা সত্য বটে, কিন্তু রূপ ত কখন রসের প্রভাব একান্ত এড়াইয়া চলিতে পারে না। রস আলাদা উপভোগ করিব, রূপ আলাদা উপভোগ করিব, মানুষের চেতনার এই ভাগাভাগি দল স্বাভাবিক নয়। মানুষের রূপ-রসানুভূতি একটা অখণ্ড চেতনা। মানুষের রূপ-তৃষ্ণা সত্যত কোথায় মিটে, মানুষের রস-পিপাসা যথার্থত কোথায় সার্থক হয়?

মানুষ পশু হইয়া কি কৃমি হইয়া, পশুর কৃমির আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখের জগৎ আঁকিয়া তুলিতে পারে; আর্ট হিসাবে যে তাহা অসুন্দর হইবেই, এমন কথা নাই কিন্তু তাহা মানুষের নিজের পক্ষে কতখানি সত্যকার জিনিষ তাহাই জিজ্ঞাস্য। রূপের মধ্যে মানুষ খুঁজিতেছে প্রেয়, তেমনি রসের মধ্যে মানুষ কি খুঁজিতেছে না শ্রেয়? শ্রেয় ও প্রেয় এই দুই-এ মিলাইয়া তবে মানুষের পূর্ণ অখণ্ড তৃপ্তি। অবশ্য এ কথা বলা বাহুল্য, প্রেয় যে রূপ তাহা শুধু দেহের আকারগত, শুধু মাংসপেশীগত নহে; তেমনি শ্রেয় যে রস তাহাও নিতান্ত সদাচারগত, সভ্যতা-ভব্যতাগত নহে।

মানুষের ভিতর দিয়া, মানুষকে অবলম্বন করিয়া ভগবান দেখিতেছেন যে রূপ, আস্বাদ করিতেছেন যে রস, ভাগবত চেতনা দিয়া শিল্পী চেতনার বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন যে রসান্বিত রূপ ও রূপান্বিত রস তাহাই মানুষের পক্ষে আদর্শ সৌন্দর্য্য।

আত্মশক্তি

কবি ও ঋষি

প্লেতো তাঁহার "রিপবলিক" হইতে কবিকে নির্ব্বাসন দিয়াছেন—আদর্শ সমাজে কবির স্থান নাই, এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞা তাঁহার। কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়—অবিশ্বাস আসে। বিশেষতঃ যখন দেখি প্লেতোর নিজের মধ্যে কবিত্বের অভাব কিছু ছিল না—তাঁহার শিষ্য আরিস্ততলের মত তিনি মোটেও শুষ্কং কাষ্ঠং ছিলেন না; রসাত্মক বাক্য সৃজনে তাঁহার প্রতিভা শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সমান, তাঁহার সরস রচনা-রীতি সাহিত্যে এখনও আদর্শ। তবে তিনি কবিদের উপর এতখানি বিরূপ কেন হইলেন?

প্লেতোর অভিযোগ, কবিরা সত্যের পূজারী নহেন, তাঁহারা হইতেছেন কল্পনার অর্থাৎ সত্যাভাস বা মিথ্যার সেবক; শুধু তাই নয়, তাঁহাদের সমস্ত কারিগরীই হইতেছে, মিথ্যাকে সত্যের, কল্পনাকে বাস্তবের মতন করিয়া দেখান—gives to airy

nothing a local habitation and a name—আরও, গণ্ডস্তোপরি পিণ্ডঃ, এই মিথ্যাকে, কল্পনাকে যথাসম্ভব সুন্দর বা চিত্তাকর্ষক করিয়া দেখান। ফলে হয় কি? মানুষ সহজেই তাহাতে ভুলিয়া যায়, একটা অলীক জগতের অলীক সৌন্দর্য্যের মোহে পড়িয়া সত্য হইতে মঙ্গল হইতে যথার্থ সৌন্দর্য্য হইতে সে বিচ্যুত হয়। কবিতা-সুন্দরী হইতেছেন যাদুকরী সার্সী (Circe) —মানুষকে ভুলাইয়া শূকর না হোক অন্ততঃ ভেড়া করিয়া রাখা তাঁহার কাজ।* দেখ না এত বড় যে কবি হোমর—দেবতার সম্বন্ধে তাঁহার কি হীন ধারণা। মানুষ অপেক্ষা কোন্ অংশে সে-দেবতা উচ্চতর জীব? মানুষের সমস্ত দুর্ব্বলতাই দেখি তাহাতে আছে, হয়ত আরও বিপুল বিকটভাবে! এই সব দেবতারই কবি আবার বলেন পূজা করিতে!

কবি হইতেছেন কল্পনা-বিলাসী, কবি অতিমাত্র মানব ভাবাপন্ন। সত্যের সহিত কাব্যের সাক্ষাৎ বা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ

* কবির সম্বন্ধে যাহাই হউক, অন্যান্য শিল্পীদের সম্বন্ধে ভারতবর্ষেও এই রকমের একটা ধারণা যে নাই তাহা নয়। বৌদ্ধদের "বিশুদ্ধি মাগ্‌গ" পটুয়া ও গায়ককে রাঁধুনীর পর্য্যায়ে ফেলিয়াছে দেখি অর্থাৎ তাহাদের সকলেরই এক কাজ, নিছক ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি। মনু এক জায়গায় বলিতেছেন গৃহী নৃত্যগীত-বাদ্য পরিহার করিবে—নট, গায়ক ও স্থপতি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় নিমন্ত্রিত হইবার অনধিকারী। চাণক্যও নট ও গায়ককে বারবণিতার শ্রেণীতে বসাইয়াছেন।

য়িহুদি ও মোস্‌লেম ধর্ম্মে মূর্ত্তি-অঙ্কন নিষেধ, একথাও এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে।

মোটেও নাই—সত্যের সাধক কাব্যের মধ্যে তাঁহার উপযোগী কোন মন্ত্র পাইবেন না। বিশেষতঃ যে সত্য মানুষের মনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, মানুষের দৈনন্দিন অনুভব উপলব্ধি যাহাকে ধারণ করিতে পারে না যে সত্যই বাস্তবিক মানুষের গূঢ়তম শ্রেষ্ঠতম সত্য, তাহার নির্দ্দেশ কবি কখন দিতে পারিবেন না। প্লেতোর যুক্তি আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে এই রকমই দাঁড়ায়।

প্লেতো যাহা বলিতেছেন তাহা যে নেহাৎ বাজে উক্তি চিন্তা করিয়া দেখিলে সে রকম মনে হয় না।

কবির, সকল শিল্পীর অর্থাৎ সকল দ্রষ্টার প্রতিষ্ঠা হইতেছে প্রাণময় জগতে। সৃষ্টি হয় প্রাণেরই স্পন্দনে—সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, প্রাণ যখন আন্দোলিত হইয়া উঠে তখনই সকল জিনিষ তাহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া প্রকট হয়। এই প্রাণই হইতেছে মায়াবী শক্তি—তাহা গঠিত ভোগৈষণা ও কর্ম্মৈষণা লইয়া। এই দুই এষণার তৃপ্তির জন্য—আনন্দের জন্য—রস-উপভোগের জন্য - সে প্রতিনিয়ত বিষয় সব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে; সে সব বিষয় কতখানি সত্যপ্রতিষ্ঠ, মঙ্গলের বা শ্রেয়ের দিক দিয়া তাহাদের মূল্য কতখানি সে বিচার, প্রাণের মায়া-শক্তি কখন করে না। আকাশকুসুম রচিয়া যদি তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি, তবেই যথেষ্ট—সে আকাশকুসুম বাস্তবেই যে রূপ লইবে তাহার কি অর্থ?* অনুভবের মধ্যে কোথাও যদি সে ধরা দেয়,

* এই রকম একটা জগৎকেই বার্ণার্ড শ' নাম দিয়াছেন নরক—Man and Superman নামক তাঁহার নাটক দ্রষ্টব্য।

আসিয়া তৃপ্তি দেয় তবেই যথেষ্ট। এই প্রাণই আবার মানুষের সকল বাসনার কামনার ভূমি। মানুষকে একান্ত মানুষ করিয়া রাখে এই প্রাণের টান সব। মানুষকে মরজীব করিয়া রাখিবার পক্ষে কাব্যের মত ঔষধ আর নাই।

কবি যে বলিতেছেন

সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই ত তোমার ভালো

অথবা

তোমার আলোয় নাই ত ছায়া...
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর

এ সব কথা শুনিতে সুন্দর ও চমৎকার বোধ হয়, কিন্তু যে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা চরম সত্যের ভাণ ইহারা করিতেছে তাহার কষ্টিপাথরে ইহারা কল্পনার বিলাস, খোস-খেয়াল মাত্র; সেই অধ্যাত্মের চেতনার অনুভূতি সত্যতঃ যাহা হয় তাহা অন্য রকমের।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে?
'আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে'
বাঁধা সবার কাছে—

কবি এখানে চিন্তার কারচুপিতে, বাক্য যোজনার চাতুর্য্যে আমাদের হঠাৎ ধাঁধা লাগাইয়া দেন কিন্তু ধীর সত্য-দ্রষ্টার চেতনায়

ঐ ভাবটির পিছনে প্রাকৃত সংস্কারের দোল ছাড়া খুব বেশী আছে কিনা সন্দেহ। ইংরাজীতে ইহাকেই বলে Siren song—মায়ার কুহক।

কবি যদি এমনই ভয়ঙ্কর জীব—তবে তাঁহাকে আবার ঋষি বলা হয় কেন? ঋষি অর্থ সত্যের দ্রষ্টা, কবি বাস্তবিক পক্ষে কবি, কারণ তিনি ঋষি অর্থাৎ সত্যকে সাক্ষাৎ তিনি দেখিয়াছেন এই জন্য। কিন্তু প্রশ্ন "সত্য" জিনিষটা কি—'What is Truth?" অধ্যাত্মের সত্য আছে, তেমনি আছে অধিভূতের সত্য—কবি যে কেবল অধ্যাত্ম সত্য দেখিবেন এমন কোন কথা নাই, তিনি সবার দেখেন অধিভূতের সত্য, এই হিসাবে তাই তিনি ঋষি। প্রাকৃত জীবনের সত্য ও সৌন্দর্য্য কবি যদি উপলব্ধি করিয়া থাকেন, ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তাহাতেও তাঁহার ঋষিত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে। শ্রেয়ের স্বরূপ কবি না'ই দেখিলেন, না'ই দেখাইলেন—যদি প্রেয়ের স্বরূপও দেখাইতে পারেন তবু তাঁহাকে বলিব কবি, বলিব ঋষি।

প্লেতো এই ধরণের কবি-ঋষিকেও আমল দিবেন কি না সন্দেহ। তিনি হয়ত বলিবেন যে কবির প্রাণ শুদ্ধ সংস্কৃত হইয়াছে, যাহার চেতনা মানুষের মানুষী-চেতনাকে অতিক্রম করিয়াছে, যিনি সত্যকে সাক্ষাৎ দেখেন, অর্থাৎ তুরীয় দৃষ্টি দিয়া দেখেন তুরীয় সত্য ("Idea")—সেই সত্যকে সেই একাধারে সুন্দর ও মঙ্গলকে ভাষায় ছন্দে মূর্ত্ত যদি কেহ করিতে পারে তবেই তিনি সত্যকার ঋষি কবি বাচ্য। প্লেতো যদি আমাদের উপনিষদের কবির কথা

জানিতেন তবে হয়ত কবির সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিলেও করিতে পারিতেন।

কবিত্ব শক্তি দুইটি বৃত্তি ধরিয়া খেলিতে পারে—এক মায়িক-কল্পনা, আর-একটা দিব্য-দৃষ্টি, অপরোক্ষানুভূতি। মায়িক-কল্পনা অর্থ খোস-খেয়াল, ইংরাজীতে যাহাকে বলে fancy ; এই fancy চমৎকার চমকপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতেছে চঞ্চল প্রাণের বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ের চপল চাতুর্য্য, তর্ক-বুদ্ধির চিন্তা-বিলাস—পক্ষান্তরে দিব্যদৃষ্টি বা অপরোক্ষানুভূতি উদ্ভাসিত করিয়া ধরিতেছে তাহাই যাহা বস্তু, যাহা সত্য—ইহা হইতেছে অন্তরাত্মার প্রজ্ঞা। কেবল মায়িক-কল্পনা যে-কবির একমাত্র আশ্রয়, তিনি কবি হইলেও হইতে পারেন কিন্তু তিনি কদাপি ঋষি নহেন ; দিব্য-দৃষ্টি দিয়া যিনি দেখেন ও সৃষ্টি করেন তিনিই কবি এবং ঋষি।

বস্তুতঃ ঋষি-কবির চক্ষে অধ্যাত্ম ছাড়া আর কিছুই প্রতিভাত হয় না। পূর্ব্বে অধ্যাত্ম ও অধিভূতের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলিয়াছি, আসলে কিন্তু দিব্য-দৃষ্টি সম্পন্ন কবির কাছে সে পার্থক্য নাই। দিব্য-দৃষ্টি আধ্যাত্মিক জিনিষের মধ্যে আত্মাকে দেখে, আধিভৌতিকের মধ্যেও আত্মাকেই দেখে—ঋষি কবি যখন অতি স্থূলের, দেহের কথা বলিতেছেন তখনও তিনি সেই স্থূলের আত্মার যে সত্য, দেহের আত্মার (অন্নময় পুরুষের) যে সত্য তাহার কথাই বলিতেছেন। একান্ত যাহা স্থূল, একান্ত যাহা ভৌতিক তাহা চারু-শিল্পের বিষয় কখন হয় না।

প্লেতো হয়ত এই দর্শন মানিবেন না। জীবন-সাধনা আর

কাব্য-রচনা এই দুইটিকে পৃথক করিয়া উভয়ের সমান সমান মর্য্যাদা তিনি কখন দিতে রাজী হইবেন না। কাব্য-রচনা জীবন-সংস্কৃতির একটা সহায় যদি করিয়া তোলা যায়, ভাল; নতুবা শুধু সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির খাতিরে, শুধু রসোপভোগের অপেক্ষায় অসংস্কৃত প্রাণের প্রাকৃত বুদ্ধির মধুর চতুর বিলাস কোন রকমে আমাদের চেতনায় আহ্বান করিয়া না লই, প্লেতো সেজন্য আমাদিগকে সজাগ নির্ম্মম তপস্বী হইতে বলিতেছেন। কবির সৃষ্টি চাই না, চাই জ্ঞানীর (Philosopher) সৃষ্টি।

কবি সৌন্দর্য্যকে ধরিতে চাহেন প্রাকৃত প্রাণের তৃষ্ণার সহায়ে—তাই তাঁহার বিরুদ্ধে জ্ঞানী দাঁড়াইয়াছেন সত্যকে ধরিতে নৈতিক বুদ্ধির সহায়ে। কিন্তু কবির ও জ্ঞানীর মধ্যে এই দ্বন্দ্বের প্রয়োজন নাই। সত্যকার কবি সৌন্দর্য্যকে ধরিবেন প্রাণের যে বিশুদ্ধ রসবোধ তাহার সহায়ে—তবে তিনি সেই সঙ্গেই সত্যকেও ধরিবেন দিব্য-দৃষ্টির সহায়ে। দিব্য-দৃষ্টির উন্মেষ রসবোধে, আর রসবোধের প্রতিষ্ঠা দিব্য-দৃষ্টির মধ্যে। এই ভাবেই কবি ও ঋষি এক হইয়াছেন এবং ঋষি-কবির মধ্যে শ্রেয় ও প্রেয় অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আত্মশক্তি

ঋষি, কবি ও নবি

সত্যং সুন্দরং শিবং, সত্য সুন্দর আর মঙ্গল—এই ত্রয়ীর ত্রিধারায় বিশ্বের এবং বিশ্বাতীতের সকল রহস্য। সত্যের সাধক যিনি তাঁহাকে বলি ঋষি, সুন্দরের সাধক যিনি তাঁহাকে বলি কবি, আর শিবের বা মঙ্গলের সাধক যিনি তাঁহাকে বলি নবি। ঋষি সত্যের দ্রষ্টা, কবি সুন্দরের স্রষ্টা, নবি মঙ্গলের হোতা। ঋষির আছে জ্ঞানদৃষ্টি, কবির রসানুভূতি আর নবির তপঃশক্তির আকূতি —ঋষির আসন মস্তকে, কবির আসন প্রাণে আর নবির প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে। অথবা আরও বলিতে পারি, ঋষি হইতেছেন সৎ-ময় পুরুষ, নবি হইতেছেন চিন্ময় (তপোময়) পুরুষ আর কবি হইতেছেন আনন্দময় পুরুষ।

বস্তুর যাহা সত্য, যাহা সত্তা, যাহা সৎ ঋষির উদার স্বচ্ছ গভীর দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িতেছে—কিন্তু ধরা পড়িতেছে সকল বস্তুরই

সত্য সমানভাবে। ঋষির দৃষ্টিতে তাই ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য ছোট-বড় উপর-নীচ উত্তম-অধম কোন দ্বৈত কোন দ্বন্দ্ব নাই। যে দেশের যে কালের যে পাত্রেরই সত্য হোক তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না—সত্য হইলেই হইল; তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য সত্যকে আবিষ্কার করা, বস্তুর নিগূঢ় সত্তা কোথায়, অন্তরের পুরুষ কোথায় তাহা ব্যক্ত করা। জিনিষের মূল্য তিনি নির্দ্ধারণ করেন না, বস্তুর মর্য্যাদা কোথায় ও কিসে, এ প্রশ্ন তাঁহার নয়; তিনি উদাসীন সাক্ষী, নির্ব্বিকার চিত্তে নিরপেক্ষ হইয়া সকলকে দেখিয়া যাইতেছেন আর বলিতেছেন, "তোমার সত্য এই, তোমার সত্য এই, তোমার সত্য এই"।

তার পরে আসিতেছেন কবি। কবি সত্যকে কেবল দেখিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, ছাঁকা নির্জ্জলা সত্য আবিষ্কার করা তাঁহার কাজ নয়—তাঁহার কাজ সত্যকে সুন্দর করিয়া দেখান, সুরূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধরা। কবির কবিত্ব এইখানে—তিনি কি একটা ঝাড়ফুঁক জানেন, তাঁহার হাতের কি একটা কৌশল আছে যাহার কল্যাণে ন্যাংটা এমন কি রূঢ় সত্যও সুন্দর-সরস হইয়া দেখা দিতেছে। সত্য যে দিক দিয়া আনন্দময়, কবি সত্যকে সেই দিক দিয়া ধরিতেছেন; যে হিসাবে সত্য হইতেছে ঘনীভূত আনন্দ সেই হিসাবে তিনি সত্যকে দেখাইতেছেন। সকল বস্তু তিনি প্রাণের রসায়নে ভিয়ান দিয়াছেন; তাঁহার কাজ আনন্দেরই ছন্দকে মূর্ত্ত করিয়া ধরা। তবে ঋষির মত কবিও উদার নির্ব্বিকার। ঋষির দৃষ্টিতে যে সমত্ব, তাঁহারও সৃষ্টিতে সেই একই সমত্ব। সত্য [illegible]ন রহিয়াছে

সর্ব্বত্র, সৌন্দর্য্যও তেমনি সর্ব্বত্র—যেখানকার যে সত্যই হৌক না তাহা আপন ভাবে প্রাণবান রসময় সুন্দর। কবি তাই রামকে সৃষ্টি করিয়াছেন, রাবণকেও সৃষ্টি করিয়াছেন সমান আদরে— যিনি গড়িয়াছেন ডেসডেমোনা, তিনিই গড়িয়াছেন লেডী ম্যাকবেথ। হাসি কান্না, মেঘ রৌদ্র, নন্দন নরক—দুইএরই সৌন্দর্য্য সমানভাবে, অপক্ষপাতে কবি আঁকিয়া তুলিতেছেন। তাই বিকট বীভৎস পর্য্যন্ত কবির হাতে সুন্দরের, রসাত্মকের পর্য্যায়ে স্থান পাইয়াছে।

নবি আর এক ধরণের জীব। তাঁহার বৈশিষ্ট্য ঔদার্য্যে বিশালতায় নয়, তাঁহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে একাগ্রতায়, তীব্রতায়। তাঁহার গতি তির্য্যক প্রসারিত নয়, তাহা ঊর্দ্ধ প্রচালিত। আছে বলিয়াই জিনিষের যে মর্য্যাদা, তাহা তিনি স্বীকার করেন না ; বিশ্বের যাবতীয় কিছু তিনি— সত্য বলিয়া হৌক আর সুন্দর বলিয়া হৌক—কোল দিতে, বরণ করিয়া লইতে পারেন না। তিনি নির্ব্বাচন করিতেছেন, ওজন করিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার নিজের একটা মানদণ্ড আছে, তদনুসারে তিনি জিনিষ গ্রহণ করিতেছেন, বর্জ্জন করিতেছেন, উপর নীচ করিয়া সাজাইয়া রাখিতেছেন। সে মানদণ্ড তাঁহার হৃদিস্থিত তেজঃশক্তির অগ্নি-শিখা— তিনি চাহিতেছেন শ্রেয়ের প্রতিষ্ঠা. মানুষের কল্যাণ, উন্নতি ঊর্দ্ধগতি। সুতরাং যাহা কিছু তাহার বিপরীত, যাহা কিছু মানুষকে উপরের দিকে না তুলিয়া ধরিয়া নীচের দিকে টানিয়া নামাইতেছে, তাহারই বিরুদ্ধে তিনি রুদ্রমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছেন। ভাল না মন্দ, উচ্চ না নীচ, ইহা নহে উহা—প্রতিবাদে এই রকম একটা বিচার ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া

তবে তাঁহাকে চলিতে হইতেছে। সৃষ্টি যেমনটি আছে, ঠিক তেমনি ভাবে তাহাকে দেখিয়া বা দেখাইয়া নবির তৃপ্তি নাই। এই যে বিশ্ব ইহা যতই সত্য হোক, বা সুন্দর হোক নবি মনে করেন না এই জিনিষটির ঠিক এই ভাবেই চরম সার্থকতা—the best of all possible worlds. তাঁহার চেতনায় জাগিয়াছে একটা উর্দ্ধতর লোকের কায়া, ভবিষ্যৎ সিদ্ধির একটা আদর্শ—তাঁহার সকল চেষ্টা, তাঁহার এক লক্ষ্য জীবনকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া মনের মতন করিয়া লওয়া। ঋষির চোখে স্ত্রী-পুরুষ, কুমার-কুমারী, বৃদ্ধ-যুবা সকলেরই সমান সত্য, সমান মর্য্যাদা—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্‌সি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।

কবিও সুখের সাথে দুঃখ, হাসির সাথে অশ্রু, আলোর সাথে আঁধার, জীবনের সাথে মৃত্যু সমান আদরে অভিবাদন করেন—কবি সুন্দরকে চাহিয়া তাই বলিতে পারেন—

ভালো মন্দ ওঠা পড়ায়
বিশ্বশালার ভাঙ্গা গড়ায়
তোমার পাশে দাঁড়িয়ে
তোমার সাথে হয় গো চেনা

নবি কিন্তু মন্দকে চাহেন না, তিনি চাহেন ভালকে পড়া তিনি চাহেন না, তিনি চাহেন ওঠা ; বার্দ্ধক্য চাহেন না, [illegible]হেন না,

মৃত্যু চাহেন না—তাঁহার সাধনার লক্ষ্য চির-যৌবন আনন্দং অমৃতং, তাঁহার মন্ত্র—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় ।

আত্মশক্তি

সাহিত্যে সেকাল ও একাল

একালে সাহিত্যের, শিল্পের সংজ্ঞাটিই আমরা পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছি। সেকালের স্রষ্টা যে-চোখে জিনিষ দেখিতেন, গড়িতেন, আধুনিকেরা সে-চোখে আর দেখে না, গড়ে না। সেকাল ও একালের ব্যবধানটি এক কথায় নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে পারি যে, সেকালের শিল্পীরা মুখ্যতঃ চাহিতেন সৌন্দর্য্য, আর একালের শিল্পীরা চাহেন সত্য। সুন্দর একখানি রূপ গড়িয়া তোলা ছিল প্রাচীন শিল্পীর সকল প্রয়াস, আধুনিকের একমাত্র যত্ন সত্যকে, নিছক সত্যকে প্রকাশ করিয়া ধরা। পার্থক্যটুকুর জন্যই আধুনিক ও প্রাচীন শিল্পের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এমনকি হয়ত বিপরীত ধরণের হইয়া পড়িয়াছে। রূপ গড়িতে গিয়া সেকালের শিল্পী প্রথমেই প্রশ্ন করিয়া বসিতেন না তা সত্য হইল

কি মিথ্যা হইল ; তাঁহার প্রথম প্রশ্ন ও শেষ প্রশ্নও বোধ হয়, রূপ স্বরূপ হইল কি না ; পক্ষান্তরে একালের শিল্পী গোড়া হইতেই হলফ লইয়া থাকেন, কেবল সত্যই কহিব, সত্য ছাড়া কিছু কহিব না— তাহা প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক, সুন্দর কি কুৎসিত হোক, সে বিষয়ে থাকিব সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। অবশ্য জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে সত্য কি, সুন্দরই বা কাহাকে বলি ? হয়ত বা এমন একটা জায়গা আছে যেখানে সত্যও যাহা, সুন্দরও তাহাই—Beauty is truth and truth beauty ; কিন্তু ইহা অনেক পরের কথা, সাধারণ দৃষ্টিতে ত দেখি ঐ দুটি বস্তু এক পর্য্যায়ের নহে, উহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম চলন-বলন পৃথক ধরণের। আকাশ-কুসুম সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যে সত্যও হইবে, এমন কিছু নয় ; আবার আধি-ব্যাধি সত্য বটে, কিন্তু তাহাকে কেহ সুন্দর বলিবে না।

ফলতঃ প্রাচীনের বিরুদ্ধে আধুনিকের অভিযোগ এই যে, তাঁহারা প্রধানত আকাশ-কুসুমই রচিয়া গিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের সৃষ্টি সুন্দর অর্থাৎ নয়নাভিরাম হইতে পারে ; কিন্তু ঠিক এইজন্যই তাহা চিত্তের অন্তরঙ্গ বস্তু হইতে পারে না। স্বপ্নদৃষ্ট ইন্দ্রধনুর বিচিত্র কল্পনা দিয়া মনকে ভুলাই[illegible]রাখা যায়, কিন্তু তাহা যে খোসখেয়ালের অবসর বিনোদনের [illegible] মানুষের দেহ প্রাণ মনকে সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিতে [illegible] এক মানুষেরই জাগ্রতের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ক[illegible] নিত্যনৈমিত্তিক সুখদুঃখই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ উপাদান—সহ[illegible] সত্যের রূপে শেষ নাই, তাহার রসে তল নাই।

প্রাচীন[illegible]শিল্পী যে কোন্ জগতের কথা বলিতে চাহেন তাহার

কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না, কোন্ জগতের কথা বলিতে বলিতে কোন্ জগতে যে চলিয়া যাইতেন তাহারও হিসাব কিছু রাখিতেন না। পৃথিবীর বক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে অবলীলাক্রমে হঠাৎ কোন্ সময়ে অমরাবতীর স্কন্ধে উঠিয়া গিয়াছেন; মানুষের সঙ্গে দেবদানব, পশুপক্ষীর সহিত গন্ধর্ব্ব কিন্নর, ইহলোকের সাথে অতিলৌকিক বস্তু সব অক্লেশে মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবের ও কল্পনার, জাগ্রতের ও স্বপ্নের, সত্যের ও মিথ্যার মধ্যে কোন ব্যবধানই তাঁহাদের চেতনায় ছিল না। হোমর ট্রয়যুদ্ধ বর্ণনা করিতে গিয়া সমস্ত "অলিম্পিয়া" বা দেবলোক মর্ত্ত্যলোকে নামাইয়া আনিয়াছেন; সেক্সপীয়রও দেখি মানুষজীবনের ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে ভূত-পেত্নী, পরী-জিনের আমদানি করিয়াছেন অজস্র। পক্ষান্তরে আধুনিক শিল্পীকে দেখি যখন তিনি অতিলৌকিকের কথা বলিতে গিয়াছেন সেখানেও তাহাকে যতদূর সম্ভব লৌকিক করিয়া ফেলিয়াছেন,—অবাস্তবকে বাস্তব না করিয়া অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক না করিয়া তাঁহার তৃপ্তি নাই, স্বস্তি নাই। প্রমাণ বার্ণার্ড শ'এর জোয়ান অব্ আর্ক।

একালের শিল্পী বলিতেছেন, সত্য [illegible] আছে তেমনটি করিয়া দেখাও, তাহা সুন্দর মনোহর হইল কি [illegible] সেদিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই। জগতে অসুন্দর শ্রীহীন [illegible] অভাব নাই—সৃষ্টিরহস্যের অনেকখানিই তাহার জুড়িয়া [illegible] সেগুলি বাদ দিয়া ফল কি, বা রাখিয়া ঢাকিয়া দেখাইবার চেষ্টাতে [illegible] লাভ কি? "মা বিরাজেন সর্ব্বঘটে,"—সুতরাং দেখাও তাঁহার [illegible]ার মূর্ত্তি।

সত্যের কোন অলঙ্কার, কোন প্রসাধনই প্রয়োজন নাই। শিশুর মত সত্যেরও উলঙ্গ মূর্ত্তিই স্বাভাবিক ও সুন্দর। সত্যকে সত্য হিসাবেই দেখাও, তাহাতেই সত্যের সৌন্দর্য্য।

প্রাচীন-পন্থীরা এইখানে বলিতেছেন, জগতের আধি-ব্যাধি সত্য বটে, কিন্তু সুন্দরও যদি হয়, তবে কোন্ হিসাবে? আধি-ব্যাধিকে যে চক্ষে সুন্দর দেখি, সেই চক্ষে আকাশ-কুসুমকেও সত্য দেখিব না, তাহারও স্থিরতা আছে কি? বস্তুতঃ আধুনিকেরা "সত্যবাদী" হইয়াছেন বটে, কিন্তু সকল সত্যবাদীর মত সত্যকে ক্রমে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া চলিয়াছেন। কল্পনার, খোসখেয়ালের হাওয়ায় পাছে কবি বেশী দূরে উধাও হইয়া চলিয়া যান, এই আশঙ্কায় তাঁহার পা দুইখানি পৃথিবীর সাথে জাগ্রতের সাথে আঁটিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবল সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে বাস্তবের মধ্যে আমরা নামিয়া আসিয়াছি, বাস্তবের আবার যাহা ঘোর বাস্তব তাহাই ক্রমে আমাদের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছে। দৃষ্টি আর আমাদের উপরের দিকে চলে না, ক্রমেই তাহা পৃথিবীতে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া তাহার [illegible]রের ক্লেদ পঙ্ক, তাহার বিষাক্ত বাষ্প, তাহার উত্তপ্ত গৈরিকস্রা[illegible] তাহার কৃমি কীট সব বাহির করিয়া ফেলিতেছে। শুধু [illegible]র তরে যে গান সে-দিক্ হইতে কান আমরা ফিরাইয়া [illegible], কিন্তু এখন যে পৃথিবীর গানও শুনিতেছি না, এখন শুনিতে[illegible] গান্ রসাতলের হাহাকার।

সুন্দর হই[illegible]ত সত্যের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়া গিয়াছে বলিয়া একালের রচনা-ধারা[illegible]রও দুই-একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে। সৌন্দর্য্যের

পূজারী সেকালের সাহিত্য ছিল আভিজাত্যের সাহিত্য—গুণীজনের অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠ পরিষদের রুচিকে তৃপ্ত করাই ছিল তখনকার শিল্পীর লক্ষ্য। একালের সাহিত্য হইতেছে "গণবাণী"; সাধারণ্যের শূদ্রের কুলি-মজুরের—গরীবের, দুঃখীর, নিপীড়িতের গৌরব সে প্রচার করিতেছে। একালে অলকাও নাই, অমরাবতীও নাই; একালে সাহিত্যের রঙ্গ-ক্ষেত্র হইতেছে বস্তি, হাঁসপাতাল। সেকালের সাহিত্য ছিল স্বপ্নের বস্তু, উপভোগের বস্তু, পোষাকী জিনিষ; একালের সাহিত্য আটপৌরে নিত্য প্রয়োজনের জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে, বহুর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতেছে, বহুর পিপাসা সে মিটাইতেছে। সাহিত্যেও সোভিয়েটের আসন শক্ত হইয়া বসিতেছে।

সোভিয়েটের সঙ্গে একালের সাহিত্যের আরও মিল আছে। সেকালের সাহিত্য দেশ হিসাবে, বিশেষ শিক্ষা-সাধনা হিসাবে একটা বিশেষ মূর্তি লইয়া, একটা বিশি[illegible] ধারায় দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক জাতির সাহিত্যে ছিল একটা [illegible]ব রূপ। কিন্তু আজকাল সোভিয়েট যেমন নেশনের দেউল [illegible] দিয়া সকল মানুষকে অর্থাৎ সকল দেশের সকল শ্রমিককে [illegible]গুলীভুক্ত করিয়া তুলিতে চাহিতেছে, সেই-রকম ইদানীন্তন "বিশ্ব [illegible]ত্যের" পিছনেও যেন দেখিতেছি, তদনুরূপ এক প্রেরণা—সক[illegible]শের সাহিত্য এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়া, তাহাকে মানব-সমাজে[illegible] বর্ণের মুখপাত্র করিয়া তোলা। ইহার একটি কারণ অবশ্য এই যে, একালে পৃথিবী অনেক ছোট হইয়া গিয়াছে, সকল দেশের মানু[illegible] মধ্যে অধিক

উদার মিলামিশা আদান-প্রদান চলিয়াছে। আগে কোন দেশের কোন হাওয়া অন্য দেশে পৌঁছিতে সময়ের প্রয়োজন হইত, আর পৌঁছিলেও অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়া তবে পৌঁছিত। কিন্তু বর্ত্তমানে মস্কৌর হাওয়া এক নিমিষে চীনের গায়ে গিয়া লাগিতেছে, আয়র্লণ্ডের কণ্ঠ মিশরে অবলীলাক্রমে শুনা যাইতেছে, আবার নরওয়ের "অরোরা" আমি কলিকাতার ঘরে বসিয়া স্বচক্ষে দেখিতেছি। একালে ইচ্ছা হইলেও আর একান্তে কোথাও নিভৃতে শান্তিতে থাকিবার উপায় নাই; বাস্তবিকই পৃথিবীর মহামেলায়, একেবারে হাটেরই মাঝে আমরা সকল পসরা খুলিয়া একাকার হইয়া বসিয়া গিয়াছি।

সুন্দরকে দেখিব, গড়িব কি ? সেজন্য শান্ত সংহত অন্তর্মুখী হওয়া দরকার—কিন্তু কোথায় অবসর ? আমাদের সমস্ত চেতনা বাহিরের দিকে, বিস্তারের দিকে মুখ করিয়া চলিয়াছে। আজ প্রয়োজনের জগৎ তাহার অভাব-[illegible]যোগ, তাহার রূঢ় সত্য সব লইয়া আমাদের প্রাণের দুয়া[illegible] দিয়াছে—আমাদের কায়-মন-বাক্য একযোগে এই কাজে[illegible]তো তন্ময় হইয়া গিয়াছে; অকাজের অর্থাৎ কেবল আনন্দের[illegible] যে দিকে, সে-দিকের জানালা-দুয়ার সব আমাদের বন্ধ।

আধুনিকেরা ব[illegible] সব রকম সত্য সকলে ধরিতে পারে না—তাহাতে অমর্যাদ[illegible] নাই। তাঁহারা সত্যের যে-মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাহা পূর্ণ সত্[illegible] না হইতে পারে, পূর্ণ সত্য দেখাইতে তাঁহারা চাহিতেছেন [illegible] সত্যের ঐ একটা ভগ্নাংশ ভাল করিয়া, স্পষ্ট করিয়া

দেখাইতে পারিলেই তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক। আর তাঁহারা যে-সত্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে যদি সৌন্দর্য্য না থাকে, না'ই থাকিল -- সেখানে যাহা আছে তাহার নাম রস। সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা রসই কি শিল্পীর লক্ষ্য নয়? সৌন্দর্য্যও রসের আধার হইতে পারে, কিন্তু সত্যের মধ্যে যে-রস, সেই রসই গাঢ়, গভীর। সৌন্দর্য্যের রস প্রেয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রেয় হইতেছে সত্যের রস।

কিন্তু রস কাহাকে বলি? বস্তুর সত্তা হইতেছে সত্য আর এই সত্তায় যে আনন্দ তাহাই রস। রসসৃষ্টি অর্থ সত্যের অন্তরস্থ আনন্দকে ব্যক্ত করিয়া ধরা, আর আনন্দের যে ব্যক্ত মূর্ত্তি, যে সুঠাম সুঘীম সুবিন্যস্ত রূপ তাহারই নাম সৌন্দর্য্য। সত্যকে 'সত্য' হিসাবে দেখা ও দেখান বিজ্ঞানের কাজ হইতে পারে, কিন্তু শিল্পের কাজ রূপ গড়া, সত্যকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করা। যে-সত্য সৌন্দর্য্যে অর্থাৎ আনন্দের ছন্দে শৃঙ্খলিত, সংগঠিত (organised না হইয়া উঠিতেছে তাহা শি[illegible]আসরে অপাংক্তেয়।

ফলতঃ একালের মত নি[illegible] শিল্প বা সাহিত্য পৃথিবীতে কোথাও কোন দিন ছিল কি না, স[illegible]। মনে হয়, এক হিসাবে গ্রীক ট্রাজেডিও তাহার কাছে হার মা[illegible] একালের শিল্পের অঙ্গে অঙ্গে, তাহার গড়নে, তাহার চলনে যেন [illegible] উঠিয়াছে আত্মপীড়ন —সত্যের জন্ম আর আনন্দ হইতে [illegible]র মধ্যে নয়, সত্য জন্মিতেছে কেবল ঘোর কষ্টেরই ভিত[illegible] শিল্পপুরুষ গীতায় শ্রীভগবানেরই মত আজ যেন আত্মহস্তে [illegible]পীড়িত হইয়া বলিতেছে—

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং—

তবে কি শিল্পরচনায় দুঃখের বেদনার স্থান নাই? কেবলি কুহু-কেকা, কালিন্দী কমল, কেবলি হাসি, কেবলি আনন্দ? তবে সেক্স্‌পীয়র কোথায় থাকেন, ট্রাজেডি সব যায় কোথায়? করুণ-রসের অর্থই বা কি? এ প্রশ্নের উত্তর পাশ্চাত্য সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল বহুপূর্ব্বে দিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতকের গোড়ায়, ফরাসী দেশে রোমান্টিক আন্দোলনের যিনি নিজেই সূত্রধার, সেই শাতোব্রিয়ঁা (Chateaubriand) কি বলিয়াছেন শুনুন;—"তোমার প্রাণটাকে ধরিয়া যন্ত্রণা দিতেছ বলিয়া তুমি যে প্রকাণ্ড লেখক তাহা মোটেও মনে করিও না। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি যাঁহারা (Muses) তাঁহারা স্বর্গের অধিবাসিনী, দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কখন তাঁহারা নিজেকে কুৎসিত করিয়া তোলেন না—যখন তাঁহারা কাঁদেন তখনও তাঁহাদের গোপন লক্ষ্য থাকে যাহাতে সুন্দর দেখায়।"*

শিল্পীর মধ্যে এই যে [illegible]কু আন্তরিকতার অভাব, ইহাতে

* On n'est poin[illegible] grand ecrivain, parcequ'on met l'a'me a' la torture[illegible] Muses sont des femmes celestes qui ne defigure[illegible]nt leurs traits par des grimaces: quand elles pl[illegible] c'est avec un secret dessein de s'embellir."

"Atala" Preface.

আশ্চর্য্যের কিছু নাই, ইহা দোষেরও নয়। কারণ, ভাল কথায় এই জিনিষটির নাম হইতেছে নির্লিপ্ততা; উদাসীনতা। বিষয় হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া দূরে না রাখিতে পারিলে, দ্রষ্টা হইয়া না দাঁড়াইতে পারিলে স্রষ্টাও হওয়া যায় না। বিষয়ের মধ্যে মত্ত হইয়া যাওয়া, তাহার সহিত আপনাকে মিলাইয়া গুলাইয়া দেওয়া হৃদয়বত্তার পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু এই ভাবে স্রষ্টার ঈশ্বরত্ব দেখা দেয় না। কবির মত বহু সাধারণ মানুষই বোধ করে, অনুভব করে, এমন-কি সমানে তীব্রভাবেই বোধ করে, অনুভব করে; কিন্তু তবুও তাহারা কবি হইয়া উঠে নাই। আধ্যাত্মিক রসের সাধক যিনি, তাঁহার মত কাব্যরসের সাধককেও চণ্ডীদাসের কৌশলটি শিখিতে হইবে—

সমুদ্রে পশিব নীরে না তিতিব
নাহি দুঃখ সুখ ক্লেশ।

এই যে নির্লিপ্ততা, জলের মধ্যে থাকিয়াও পদ্মপত্রের যে ব্যবহার তাহা কাব্য-জগৎ হইতে আমরা নির্ব্বাসিত করিয়াছি। আমরা বলিতেছি, 'নির্লিপ্ত উদাসীন হওয়া এ যুগে আর সম্ভব নয়।' এযুগের সাহিত্য জীবন-মরণের সমস্যা লইয়া পড়িয়াছে; দৈনন্দিন যাত্রায় যে-সব কথা পায়ে পায়ে ঠেকিতেছে, নির্ব্বিকল্প হইয়া কি তাহাদের আলোচনা চলে? আজকাল সাহিত্যের ত খোস-খেয়ালী বিষয় আর নাই। এ কালের কবি কোন রকম তারল্য চাহেন না—নির্লিপ্ততার, উদাসীনতার ফাঁকে হাসিটুকু সহজেই দেখা দিতে পারে; তিনি ভয়ানক গুরুগম্ভীর, ভ্রূ তাঁহার কুটিল হইয়াই

আছে। Dickens, Thackeray, Shakespeareএর একটা চপলতা দেখিয়া বার্ণাড শ রীতিমত চটিয়াই গিয়াছেন।* শ'এর নিজেকার কাঠামটি দেখিতে চপল, হাল্‌কা হইলে কি হইবে, ওজনে গুণে লোহার মত এমন ভারি সাহিত্য খুব কমই আছে। গ্রীক আলঙ্কারিক আরিস্ততল্ বলিয়া গিয়াছেন, ট্রাজেডির উদ্দেশ্য প্রগাঢ় ভাবোপভোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি। সেকালের ট্রাজেডিতে তাহা বোধ হয় সম্ভব ছিল; কিন্তু একালের ট্র্যাজেডি চিত্তকে আরও ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। প্রাচীনের চিত্রাঙ্কণে সর্ব্বত্রই পাই একটা গরিমা, একটা সারল্য, একটা আর্জব। কিন্তু এ[illegible]লে সহজ সাধারণ বা আটপৌরে সত্যকেও দেখাইবার যে-রীতি [illegible]তে মিশিয়া আছে কেমন এক জটিল কুটিলের অসংস্কৃতের প্রাকৃতের স্পর্শ। সেকালের সৃষ্টি তাই যতই করুণ বেদনাতুর হোক না কেন, ক্ষুব্ধ আলোড়িত হোক না কেন, তাহার আবহাওয়ায় [illegible] বাষ্পের মত মিশিয়া আছে একটা সৌম্য প্রসন্নতা। [illegible] একালের সৃষ্টিতে তাহার পরিবর্ত্তে দেখি একটা ঝাঁজ, [illegible] রুক্ষতা, একটা অস্বস্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্য।

একালের শিল্পে সাহি[illegible] অসংস্কৃতের প্রাকৃতের অবলেপ অনেক স্থানে ইচ্ছাকৃত। ইউ[illegible] একটা আন্দোলনই উঠিয়াছে সভ্য-সমাজকে আবার পি[illegible] বর্ব্বরতার দিকে কিছু চালাইয়া লইতে। শিক্ষিত সংস্কৃত [illegible] ঘষিয়া আপনাকে এতখানি পোষাকী, কৃত্রিম, এতখা[illegible] আশমানের জীব করিয়া তুলিয়াছে, যে, এখন

* "The [illegible]intessence of Ibsenism"—The New Element.

হইতে সাবধান না হইলে তাহাকে প্রাচীন রোমকদের গতি পাইতে হইবে। পাছে এই রকম একটা বর্ব্বরের আক্রমণ আসিয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায় তাহার প্রতিষেধের জন্য ইউরোপে ফরাসী দেশে এক শিক্ষিত শ্রেণী* রব তুলিয়াছেন, "এস, আবার আমরা বর্ব্বর হই" (Rebarbarisons—nous)। আমাদের বাংলার সাহিত্যেও এই জংলা হাওয়ার ছোঁয়াচ অনেকখানি লাগিতেছে। সুন্দরকে ছাড়িয়া সত্যের পূজা প্রয়োজন হইয়াছে—এই জীবন-সংগ্রামের জন্য।

আজ কবি হইয়াছেন জীবনের নবি। তাহাতে কবির প্রয়োজন হয়ত বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু কবির কবিত্ব বাড়িয়াছে কি না তাহাই জিজ্ঞাস্য। এমন-কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন বলিতেছেন—

ওরে মৌনমূক, কেন আছিস্ নীরবে
অন্তর করিয়া রুদ্ধ এ মুখর ভবে
তোর কোন কথা নাই রে আনন্দহীন—

তখন বাস্তবিকই আমার প্রাণ কোন কথা বলে না, নীরব হইয়াই থাকে। কিন্তু সেই প্রাণই চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহার তারে তারে কি একটা সাড়া পড়িয়া যায়, যখন শুনি

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা ব'সে আছি, নাহি ভরসা।

কবি এখানে নবি নহেন, তিনি আধ-ভোট[illegible] কেবল ছবি

* এই ধরণের এক চিত্রকর-গোষ্ঠী নিজেদের নাম দিয়েছেন—Les Fauvistes—Fauve অর্থ বন্য জন্তু

আঁকিয়া চলিয়াছেন। সত্যকে যখন জোর করিয়া ধরিতে যাই, তখন তাহার খোলসটিই অনেক সময় চাপিয়া ধরি, বস্তুটি অলক্ষিতে কোথায় ইত্যবসরে অন্তর্দ্ধান করে। উপদেশকের উৎকণ্ঠায় আসল সত্য ধরা দেয় না, ধ্যানীর ঔদাসীন্যে সত্য আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে—তমেব বৃণুতে তস্যৈং স্বাং। সত্যে পৌঁছিবার হয়ত অনেক দুয়ার আছে, কিন্তু কবির পক্ষে তাহা একটিই—সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া।

হইতে পারে প্রাচীনেরা সৌন্দর্য্যের নামে অনেক সময়ে কেবল রূপেরই পূজা ও আদর করিয়াছিলেন; [illegible] এই সৌন্দর্য্যের রূপের উপর টান তাঁহাদিগকে ক্রমে একটা [illegible] সৌষ্ঠব, শোভনতা, শালীনতার মধ্যে একান্ত আবদ্ধ করিয়া [illegible]য়াছিল। একাল এই কাঠাম ভাঙ্গিয়া সুন্দরের মধ্যে দিতে [illegible]হতেছে একটা কিছু বস্তু বা পদার্থ। সে বস্তু বা পদার্থ হয়ত সুসংস্কৃত নয়, প্রকৃতির মণিগর্ভ হইতে তোলা আনকোরা জি[illegible]—তাহাতে অনেক খাদ, অনেক ময়লা মিশিয়া আছে; [illegible] [illegible]হারও যে প্রয়োজন ছিল না, তাহাও বলি কি রকমে [illegible]নকে সত্যকার ধ্যানীর দ্রষ্টার বা ঋষির চক্ষে দেখা এক[illegible]র জীবনকে বিদূষকের চক্ষে দেখা, আর। শিল্পও জীবন্ত [illegible] জীবনের সাথে একটা সরস সরাগ সম্পর্কে, একটা স[illegible]তর বন্ধনে; নতুবা জীবনকে যে শিল্প অস্পৃশ্য মনে করে, [illegible] কেবল বৈয়াকরণিকের চক্ষু দিয়া তাহা সুন্দর সুঠাম [illegible] হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রাণবান হয় না। শিল্পে এই প্রাণের, এই জীবনস্পন্দনের দাবীই বোধ হয় একালের সত্যপরায়ণতার পিছনে রহিয়াছে।

কিন্তু যে সত্যটি একালের শিল্পী কার্য্যতঃ তেমন ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, তাহা এই—জীবনের ছন্দ এক, শিল্পের ছন্দ আর ; শিল্পের মধ্যে জীবনকেই যদি মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে চাই, তবুও জীবনের গতিভঙ্গীকে হুবহু শিল্পের গতিভঙ্গীর মধ্যে তুলিয়া ধরিতে পারি না। জীবনকে শিল্পের মধ্যে তুলিয়া ধরিতে হইলেই তাহাতে দরকার একটা রূপান্তর—পাশ্চাত্যে ইহারই নাম দিয়াছে Stylisation—এই রূপান্তরের অর্থই শিল্পগত সৌন্দর্য্য।

তা ছাড়া আরও কথা আছে। কবিকে যে জীবনের অর্থাৎ বাহ্য ব্যবহারিক জীবনের সত্য কেবল বলিতে হইবে, এমনও নয়। কবির রাজত্ব আরও বিস্তৃত। সমস্ত চেতনাই হইতেছে তাঁহার রাজ্য। চেতনায় কত স্তর রহিয়াছে, প্রত্যেক স্তরের সত্য এক-এক ধরণের—তাহাদের স্বাতন্ত্র্য জীবনের সত্যের পায়ে কবি বলি দিতে যাইবেন কেন ? প্র[illegible] চিত্ত লইয়া কবি বলিতে পারেন—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়—

কেহ বাধা দিবে না, কথাটি যদি [illegible] সুন্দর করিয়া কবিত্ব করিয়া বলিতে পারেন। তেমনি নিষ্কম্পিত [illegible] কণ্ঠে আর-এক কবি বলিবেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র[illegible]—

কবির কবিত্ব এখানেও বলার ভঙ্গীতে, [illegible]নায়, Stylisationএ। সত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে উভয়কেই সত্য বলিতে হয়—কাব্যের জগতে সত্য হইতেছে একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। সেখানে এক দিক দিয়া দেখিলে যাহাকে বলি কল্পনা, খেয়াল

বা আকাশ-কুসুম—অন্ত দিক দিয়া তাহাকেই দেখি সত্য, সত্য, সত্য।

কিন্তু সে যাহাই হোক, সত্যে ও সৌন্দর্য্যে যে দ্বন্দ্ব তাহা সাধারণের গোষ্ঠীর মনে যতই প্রবল হোক না কেন—শ্রেষ্ঠ শিল্পী যাঁহারা তাঁহাদের চক্ষে সে-দ্বন্দ্ব কোন দিনই দেখা দেয় নাই, দিবেও না। Science ও Religionএ ঝগড়ার মত তাহা দাঁড়াইয়া আছে একটা অর্থ-বিপত্তি বা বুঝিবার ভুলের উপর।

যদি স্বীকার করি সত্য আছে বহু রকমের, বাস্তবই একমাত্র সত্য নয়; আরও যদি স্বীকার করি সৌন্দর্য্যও কেবল রূপগত নয়, তাহা রসগতও হইতে পারে—তবে আর কলহ করিবার কিছুই থাকে না। এক দেখিতে হইবে সত্য সত্য হইল কি না, রূপ রূপ হইল কি না, রস রস হইল কি না। ঐ ত্রয়ীর সম্মেলনে ও সমাবেশেই আদর্শ শিল্প। কারণ, সকল শিল্পের সত্য হইতেছে আত্মা, রস হইতেছে প্রাণ আর রূপ হইতেছে শরীর।

প্রবাসী

চৈত্র, ১৩৩৪

শিল্পের মর্য্যাদা

শিল্পের মর্য্যাদা নির্ভর [illegible] সে কি বলিতেছে তাহার উপর, না কেমন করিয়া বলিতেছে [illegible]তাহার উপর—অর্থ-গৌরবের উপর, না রচনা-সৌষ্ঠবের উপর? দু[illegible]লের দুই মত। একদল বলিতেছে, শিল্পের রীতিই সব; আর-এ[illegible]লিতেছে, তা কেন, বস্তুই সব। [illegible]কের দল বলিতেছে, রীতিই [illegible] বস্তু জড় উপকরণমাত্র; [illegible]ারীর দল বলিতেছে, বস্তুই আত্মা, রীতি[illegible] বাহিরের কাঠাম মাত্র। ভাব না ভঙ্গী, প্রকৃতি না আকৃতি, [illegible] না গড়ন—'রস' না 'রূপ'ও বলিব কি?—কোন্‌টি তবে প্রধান কথা, কোন্‌টি কায়া আর কোন্‌টিই বা ছায়া?

বস্তুবাদী যাঁহারা তাঁহারা বলিতেছেন হাল্‌কা বা চুট্‌কি বিষয় লইয়া উঁচুদরের শিল্প কিছু গড়া চলে না—সর্ব্বত্রই দেখি শিল্পী যত বড়, তাঁহার নির্ব্বাচিত বিষয়ও তত গুরু ও গম্ভীর। উদ্ভট-কবিতায়

রচনা-চাতুর্য্য আছে, তাই বলিয়া তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়। বরং দেখি ঠিক এই অর্থ-গৌরবের তারতম্য হিসাবেই মহাকবিদের মধ্যে মর্য্যাদার ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কালিদাস হইতে ব্যাস-বাল্মীকি বড়, আবার ব্যাস-বাল্মীকি হইতেও বেদ-উপনিষদের কবি বড়। কারণ শকুন্তলা-মেঘদূত হইতেছে ঐহিক ভোগসুখের আলেখ্য, রামায়ণ-মহাভারত বলবীর্য্যের বৃহৎ প্রয়াসের আদর্শপরায়ণতার চিত্র, আর বেদ-উপনিষদ হইতেছে আধ্যাত্মিক সাধনার রহস্য। আমাদের আদিকবি চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ আসন [illegible]ইয়া আসিতেছেন কেন? রচনা-সৌষ্ঠবই যদি কাব্যের প্রধান কথা হ[illegible]ত, তবে বিদ্যাপতিকেই তাঁহার উপরে স্থান দেওয়া হইত। চণ্ডীদ[illegible] বড়, কারণ, ভাগবত প্রেমের যত গভীর কথা তিনি বলিয়া[illegible] আর-কেহ তাহা বলে নাই। অত দূরেই বা যাইতে হইবে [illegible]ন? আজ রবীন্দ্রনাথ একরকম জগতের কবিগুরু হইয়া পূ[illegible] কোন্ গুণে? তাঁহার রচনা-চাতুর্য্য বিদেশীরা ত সম্য[illegible] উপভোগ করিতে পারে না, তবে তাহারা ভুলিল কি[illegible]রা? কারণ, রবীন্দ্রনাথ এমন একটা আধ্যাত্মিক অনু[illegible]র জগৎ খুলিয়া ধরিয়াছেন, এমন একটা সুন্দরের চেতনা জা[illegible] করিয়া দিয়াছেন যাহা আর কোথাও আমরা পাই নাই। শুধু রূপ বা গড়নের দিক্ দিয়া মদনমোহনের—

> উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
> আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।

আর রবীন্দ্রনাথের—

একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়ন 'পরে অন্তিম নিমেষ।

এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? উভয়ের কাঠাম ঠিক একই অথচ কবিত্বগুণে উভয়ের একই মর্য্যাদা কেহ দিবে না। কেন, শুধু অর্থ-গৌরবের পার্থক্যের জন্ত নয় কি? মধুসূদনী ছন্দে হাঁক দিয়া বলিতে পারি—

বঠাইয়া [illegible] যত পাষণ্ড ইংরাজে।

কিন্তু তাহাতে মধুসূদনের বস্তু-গাম্ভীর্য্য নাই বলিয়াই ত তাহা হাসির জিনিষ? ছাঁচ এক হইলে কি হইবে—একই ছাঁচে সোনাও ঢালিতে পারি, আবার কাদাও গুলিতে পারি। জিনিষের দাম ছাঁচে নয়, সার পদার্থে।

শিল্পে চাই পদার্থ, বস্তু-মাহাত্ম্য—অর্থাৎ চাই দর্শন, তত্ত্ব, সমস্তা-নির্ণয়, সত্যবিচার,—সুতরাং শিল্পী হইতেছেন প্রচারক, উপদেষ্টা, দিশারী, নেতা; অর্থাৎ শিল্পের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা হইতেছে লোকশিক্ষায়, সমাজের কল্যাণশোধনে, মানুষের নৈতিক-উন্নয়নে। এই রকমে শিল্পে যাহারা খুঁজিয়াছেন পদার্থ তাঁহারা শিল্পকে টানিতে টানিতে শেষটা স্কুল-মাষ্টারের সমাজ-সংস্কারকের হস্তে বেত্ররূপে তুলিয়া দিয়াছেন। ইবসেন্—আরও বেশী—বার্ণার্ড শ'য়ের কাছে শিল্পসৃষ্টি সাধনার শাস্ত্র বা শস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ তাঁহারা বলিবেন, যে-শিল্প শ্রেষ্ঠ হইতে চাহে তাহাকে কেবল সুন্দর হইলেই চলিবে না, তাহাকে হইতে হইবে সত্য ও মঙ্গল;

শ্রেষ্ঠ শিল্প কেবল প্রেয়ই নয়, তাহা আবার শ্রেয়। তাই ত কোরাণ, বাইবেল, আবেস্তা, গীতা, বেদ, উপনিষদ সকল সাহিত্যের সেরা সাহিত্য। রাফাএলের মাদোনা বা ভারতের নটরাজ কি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির যে তুলনা নাই, তাহারও হেতু এইখানে। শিল্প যেখানে শীল-নীতি ধর্ম্ম শিক্ষাদীক্ষার অনুগত হইয়া চলিয়াছে সেইখানেই তাহার শ্রেষ্ঠ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিব্যক্তি। কিন্তু যে শিল্প স্বাধীন 'স্বতন্ত্রী' হইয়াছে, চাহিয়াছে কেবল সুন্দরকে কিন্তু সুন্দরকে মঙ্গলের সেবক করিয়া ধরিতে পারে নাই, তাহা অনিবার্য্য অবনতির, ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে, শিল্পীকেও তাহা কথ[illegible] স্বস্তি আনিয়া দেয় নাই। গ্রীসের শেষযুগে, রোমকের শেষযুগে, বাই[illegible]ন্তিনের (Byzantine) শেষযুগে বিলাসীর শিল্পসৃষ্টি এই কথারই [illegible] প্রমাণ দিতেছে না? ব্যক্তিগত ভাবে, ইংরাজের অস্কার ও [illegible]ইল্ড (Oscar Wilde) ও ফরাসীর পিয়ের লুইস্ (Pierre [illegible]ouys) কেবল সৌন্দর্য্যের পূজা করিতে করিতে কোথায় [illegible] পড়িয়াছিলেন, সেই দারুণ পরিণাম কি একই শিক্ষা দি[illegible]না ?

এই গেল এক দিকক[illegible] কথা। প্রতিপক্ষ বলিতেছেন, শিল্পের বিষয় কি, শিল্পের দিক হইতে সেটি অবান্তর প্রশ্ন। শিল্পীর শিল্প নির্ভর করিতেছে তিনি কি কথা বলিয়াছেন তাহার উপর নয়, কিন্তু যে-কথা বলিয়াছেন তাহা সুষ্ঠু করিয়া বলিতে পারিয়াছেন কি না তাহার উপর, তা যে কথাই হউক না কেন। বিদ্যাসুন্দর হইতে অন্নদামঙ্গলই যদি বরণীয় হয় তবে কবিত্বের জন্ম নয়। বিষয়ের মর্য্যাদা দিয়াই যদি কবিত্বের মর্য্যাদা হইত, পঞ্চদশীর মত কাব্য

ত্রিভুবনে মিলিত কি না সন্দেহ। আর উপনিষদের কবিকে, কি রামায়ণের কবিকে যদি শৃঙ্গারতিলক বা মেঘদূতের কবি হইতে কবি-হিসাবেই উচ্চাসন দেই তবে উপনিষদ রামায়ণে সুমহান্ সদুপদেশের জন্য নয়; তাহার কারণ উপনিষদে রামায়ণে সৃষ্টি-চাতুর্য্য, গড়ন-রূপন ভঙ্গীই চমৎকার, অতুলনীয়। তবে বিষয়ের গভীরত্ব গম্ভীরত্ব এই দিকটা এতখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে যে হয়ত তাহা আমাদের চোখেই পড়ে না। চণ্ডীদাসের মাহাত্ম্য এমন (ভগবৎ) প্রেমের কথা বলিয়াছেন সেইজন্য নয়, কিন্তু (ভগবৎ) প্রেমের কথা এমনভাবে বলি[illegible]ছেন, সেইজন্য। শিল্পী বুদ্ধ-মূর্ত্তিকেও আঁকিয়াছেন, মিথুন[illegible]ত্তিকেও আঁকিয়াছেন সমান পক্ষপাতশূন্য হইয়া, বিশেষ ব্যক্ত[illegible]াধার তাহা সৌন্দর্য্যলীলার আশ্রয়মাত্র। সেই সৌন্দর্য্য যতখানি [illegible]রিস্ফুট ততখানি সেই আধারের মর্য্যাদা—তাই গান্ধারের বুদ্ধমূর্ত্তি ব[illegible]বিবর্ম্মার শিবের শিল্পহিসাবেই কোনই মূল্য নাই;—ধার্ম্মিকের চ[illegible]তাহা যতই পূজ্য, এমন কি সুন্দরই বলিয়া বিবেচিত হোক না।

ফলতঃ, শিল্পে যে আমরা সত্যের [illegible]ঙ্গলের স্থান বা প্রাধান্য চাই, সে দাবী মানুষের শিল্পবোধের দিক্ হইতে নয়, তাহা হইতেছে মানুষের ধর্ম্ম ও নীতিবোধের কথা। জীবনে মানুষের মধ্যে এই দুইটি দিক্ ওতঃপ্রোতঃ জড়িত, সুতরাং একের প্রয়োজন যে অন্যটির স্কন্ধে সে চাপাইয়া দিবে তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। বিশেষতঃ ব্যবহারের দিক্ হইতে সর্ব্বসাধারণের কাছে ধর্ম্মের নীতির ক্ষেত্রটাই চোখের সম্মুখে বৃহৎ হইয়া জাগিয়া আছে—সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্র তাহার

চেতনার গৌণ দিক। তাই ধর্ম্মের মানদণ্ড কেবল ধর্ম্মক্ষেত্রের জন্যই নয়, ঐ মানদণ্ডে আমাদের জাগ্রত চেতনা এত অভ্যস্ত যে, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেও উহাই ধরিয়া আমরা মাপ করি, বিচার করি। কিন্তু সমাজে বর্ণসঙ্করের ন্যায় ইহা চেতনায় বৃত্তিসঙ্কর। সৌন্দর্য্যের পূজারী যিনি তিনি সৌন্দর্য্য-জিজ্ঞাসার ধর্ম্মবোধকে নৈতিকতাকে পৃথক করিয়া সরাইয়া রাখিবেন, শুধু তাঁহার নির্জ্জলা সৌন্দর্য্যবোধ দিয়াই সৌন্দর্য্যের বিচার করিবেন; তখন তিনি দেখিবেন না জিনিষটি ভাল কি মন্দ, সত্য কি মিথ্যা—তিনি দেখিবেন শুধু তাহা সুন্দর কি অসুন্দর। শিল্প-সৃষ্টিতে যাহা বস্তু বা বিষয় তাহা বড়-জোর বিশেষ একটা রসের যোগান দিতে পারে, কিন্তু সেই রস রূপের মধ্যে যে-হিসাবে যতখানি শরীরী হইয়া উঠিতেছে সে-হিসাবে ও ততখানিই তাহা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতেছে। রস-সৃষ্টি করাই যদি শিল্পের লক্ষ্য বলিয়া ধরা হয়, তবে বলিব বস্তুগত রস নয়, কিন্তু রূপগত রস, সুন্দর রূপই যে রস জাগাইয়া ধরিতেছে তাহাই শিল্পে উদ্দিষ্ট রস। এই যে রূপের পিপাসা ইহারই প্রেরণায় ব্রজ-গোপীদের মত কবিরাও কুলশীল সব ভাসাইয়া দিয়াছেন, এই যে সৌন্দর্য্যের উপর অহেতুকী টান, চিত্তের এই যে রঞ্জিনী-বৃত্তি শিল্পীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কবির ভালবাসা কোন্ পাত্রে গিয়া পড়িতেছে তাহা আসল কথা নয়, আসল কথা এই ভালবাসার স্বরূপ। ঔপনিষদিক সত্য হোক আর প্রাকৃত সত্য হোক কবির চিত্ত উভয়কেই সমানভাবে রঞ্জিত অর্থাৎ সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে।

সুতরাং কালিদাসের মতই বলি—

শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং

অথবা উপনিষদের মত বলি—

কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা

বিদ্যাপতি ঠাকুর যে কহিতেছেন—

শৈশব যৌবন দুঁহু মেলি গেল

আর রবীন্দ্রনাথ যে কহিতেছেন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি

—সৌন্দর্য্য-রচনার দিক হইতে উভয়েরই সমান মর্য্যাদা ; বিষয়ের গুরু-লঘু-তারতম্যে একটিকে ব্রাহ্মণের আর-একটিকে শূদ্রের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না।

এই রকম যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই আজকাল এক শ্রেণীর শিল্পী দাঁড়াইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা art for art's sake এই সুপ্রাচীন মন্ত্রটি একেবারে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়াছে এখন বিশুদ্ধ শিল্প (pure art), অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিল্পের ধারা আপনার বৈশিষ্ট্যকে ধরিয়াই বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য গড়িয়া তুলিবে। অন্য শিল্পের নিকট হইতে কি অন্য কোন ক্ষেত্র হইতে কোন রকম পরধর্ম্ম ধার করিতে যাইবে না। এক সময় ছিল যখন, শিল্পে শিল্পে বিভিন্ন চারুকলার সম্মেলনেই শিল্পী তাঁহার কৃতিত্ব দেখাইতে চাহিয়াছেন। Wagnerএর প্রতিভা—সঙ্গীত ও কবিতায় অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধনে। কাব্যে চিত্রের ও ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্য, চিত্রে কাব্যের সৌন্দর্য্য, ভাস্কর্য্যে চিত্রের সৌন্দর্য্য

—এই রকমে সকলের সহিত সকলকে মিলাইয়া-মিশাইয়া শিল্পীরা এতদিন রূপসৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে কথা উঠিয়াছে—তাহা নয়, প্রত্যেকে আপনার স্বাতন্ত্র্য অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিবে, কেবল আপন স্বধর্ম্ম ধরিয়া চলিবে, নিজের সত্তার গণ্ডী যেটুকু তাহারই মধ্যে নিজের বিশেষত্বটি যে যত ফলাইয়া ও খেলাইয়া তুলিবে তাহারই তত কৃতিত্ব। চিত্রকর যিনি, পটুয়া যিনি, তাঁহার উপকরণ হইতেছে রং ও রেখা; সুতরাং কেবল রংএর ও রেখার লীলা-খেলার কি সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাই তিনি দেখাইবেন। রেখার সরল বক্র এলায়িত গতিতে কি ছন্দ, রেখায় রেখায় মিলিয়া কত রকমের প্রকার রেখার আকার সব গড়িয়া তোলে, আকারে আকারে মিলিয়া কত সঙ্গত সৃষ্টি করে, আবার বর্ণের সমাবেশে পর্য্যায়ীত্যে কত রকমারি মেলা বসিয়া যায়—এই হইতেছে চিত্রশিল্পীর কাজ। নতুবা রংএর ও রেখার সহায়ে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা একটা ঘটনা, একটা বিশেষ বস্তু কিছু চিত্রিত করিতে হইবে, এমন কোন প্রয়োজন নাই। বরং ঐ রকম অবান্তর চেষ্টাতে রং ও রেখা মুক্ত স্বচ্ছন্দ অমিশ্র সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে পারে না। বস্তুকে প্রকাশ করিতে গিয়া নিজের বিশুদ্ধ রূপটি ফলাইয়া ধরিতে পারে না। সেই রকম সঙ্গীতেও চাই কেবল সুরের খেলা, ধ্বনির নৃত্য—কথার সহিত ধ্বনিকে যত জুড়িয়া দিতে চাহিব কিংবা একটা স্পষ্টভাব কিছু ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব, ধ্বনি তত আড়ষ্ট ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে, নিজস্ব সৌন্দর্য্য তত কম অনায়াসে সে ব্যক্ত করিতে

পারিবে। স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যেও চাই কঠিন পদার্থকে ধরিয়া শুধু রেখাপাতের আয়তন (volume) সন্নিবেশের কৌশল। বিশেষ আকার আমি যাহাই গড়ি না কেন, তাহা বুদ্ধের মূর্ত্তি হোক বা ভিনসের মূর্ত্তি হোক অথবা লতাপাতা, আলিপনা হোক তাহাতে শিল্পমর্য্যাদার কোন ব্যতিক্রম হয় না। সকল শিল্পই মূলত হইতেছে মণ্ডনের অলঙ্কারের শিল্প (Decorative art)।

কাব্যের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা একটু কঠিন। কাব্যের উপকরণ বাক্য; বাক্যের সৌন্দর্য্য দেখান অথবা সৌন্দর্য্যকে বাক্যের মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া বাঙ্ময় করিয়া ধরা হইতেছে কাব্যের সমস্ত প্রয়াস। কিন্তু বাক্যের বস্তু বা সার হইতেছে অর্থ—এখানেও যদি বস্তুকে একান্ত বাদ দিয়া তবে বাক্যাবলীর সৌন্দর্য্য দেখাইতে হয় তবে অর্থকেই বাদ দিতে হয়। তবুও এই দুঃসাহসের চেষ্টা যে না হইয়াছে তাহা নয়—তখন পাই অর্থের পরিবর্ত্তে অক্ষরের ঝঙ্কার, শব্দকে আশ্রয় করিয়া ছন্দের তালের অলঙ্কারের কারিগরি। এই ভাবের ভাবুক হইয়াই কবি পাঙ্কীর, রেলগাড়ীর, চরকার বাঙ্ময় রূপ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।*

* আর-এক শ্রেণী অবশ্য অর্থকে চাপা দিয়া রাখিতে চাহিতেছেন, অর্থের উপরে উঠিয়া যাইবার জন্য ব্যক্ত বস্তুকে অতিক্রম করিয়া অব্যক্ত ভাবের সন্ধানে। বাক্য তাঁহারা ব্যবহার করিতে চাহেন কেবল ইঙ্গিতরূপে, গৌণ-আশ্রয় অবলম্বন রূপে। তাঁহাদের কাছে স্পষ্ট অর্থের ত কোন মূল্যই নাই, বাক্যেরও মূল্য বাক্যের মধ্যে নয়—কিন্তু বাক্য যতখানি নির্ব্বাক হইতে পারিতেছে, পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে, ব্যঞ্জনার জননার জন্য ফাঁকের আকাশের সৃষ্টি করিতে

এই পথে চলিয়া যদি কেহ একদিন বলিয়া বসে যে, ছন্দের সূত্রই হইতেছে আদর্শ অর্থাৎ নির্জ্জলা বিশুদ্ধ কাব্য তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার নয়। কারণ কাব্য হইতে অন্যান্য অবান্তর ভাব বা রস বাদ দিয়া কেবল যদি কাব্যগত সৌন্দর্য্যটুকু—নীর বাদ দিয়া ক্ষীরটুকু—যদি গ্রহণ করি তবে অবশিষ্ট কি থাকে? সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য যদি উপভোগ করিতে চাই তবে কালিদাসের—

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারাপ্রমত্তঃ

—শুনিয়া কোন লাভ নাই, যক্ষের বিরহব্যথা অতি অবান্তর কথা, কবিত্ব হিসাবে এখানে যাহা সুন্দর উপভোগ্য তাহা হইতেছে যে কাঠামে বা ছাঁচে এই সব কথা গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে, সুতরাং আসল সেরা কাব্যের কাব্য হইতেছে—

মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসম গৈ মে'। ভ[illegible]তৌ গযুগ্মম্

—এ যেন বাহিরের ইন্দ্রিয়লভ্য নানা রূপ অতিক্রম করিয়া কাব্যের সমাধিগূহ্য-স্বরূপ—তদেব বস্তুমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যম্ ইত্যাদি!

তবে আশা, কাব্যের কঙ্কাল পূজা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে এমন কবি-কাপালিক সচরাচর বড় বেশী দেখা যায় না।

কিন্তু আসল কথা এই, বস্তুর ও রূপের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের

পারিয়াছে, ততখানিই তাহার সার্থকতা। কিন্তু ইঁহারা মোটেও রূপবাদীদের দলে নহেন। বরং ইঁহারা আরও ঘোর বস্তুবাদী। তবে ইঁহাদের বস্তু হঠাৎ, পূর্ণ পরিণতি না হইয়া, আর-এক ধরণের—তাহার নির্দ্দেশ একমাত্র এইকথায় —কি পুছসি অনুভব মোর।

বৈপরীত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়, তাহা হইতেছে মতবাদের কথা অর্থাৎ একটা সত্যকে অতিমাত্র করিয়া তুলিবার ফল, একচোখে দেখিবার ফল। নতুবা বস্তুর ও রূপের সম্বন্ধ হইতেছে আত্মার ও দেহের সম্বন্ধ। বস্তু ছাড়া রূপ এবং রূপ ছাড়া বস্তু বলাও যা, আত্মা ছাড়া দেহ এবং দেহ ছাড়া আত্মা বলাও তা। একটিকে বাদ দিয়া আর-একটির সার্থকতা নাই; বাদ দেওয়া ত দূরের কথা, কোন একটিকে প্রধান করিয়া তুলিলেও ওজন ঠিক রাখা যায় না। আত্মাকে একান্ত অত্যন্ত ও অতিরিক্ত করিয়া ধরার ফল শঙ্করাচার্য্য; আর দেহকে একান্ত অত্যন্ত অতিরিক্ত করিয়া ধরার ফল চার্ব্বাক। উপনিষদের মতে উভয়েই—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি।

শিল্পগত যে সৌন্দর্য্য-[illegible]মা তাহাতেও চাই এই দুইএর সংযোগ ও সম্মিলন। রূপ ভি[illegible] বস্তুকে অর্থাৎ কেবল তত্ত্ব বা সত্যকে ধরিয়া দেখান শিল্পের কাজ নয়, তাহা হইতেছে দর্শনের বিজ্ঞানের কাজ; আবার বস্তু ভিন্ন শুধু যে রূপ তাহাও শিল্প নয়, তাহা হইতেছে ব্যাকরণ। সুরূপের মধ্যবস্তুকে প্রকটমূর্ত্তি করিয়া ধরা ইহাই ত শিল্পরচনার সনাতন সহজ রহস্য।

তবে যে-তথ্যটি আমাদের চেতনায় সচরাচর ধরা দেয় না, যাহা আমরা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করি না, তাহা হইতেছে বস্তুর ও রূপের কেবল সমন্বয় সামঞ্জস্য নয়, তাহাদের চরম ঐক্য ও একত্ব। সাধারণ দৃষ্টিতে বস্তু ও রূপ দুইটিকে দুই পর্য্যায়ের জিনিষ বলিয়া মনে হয় এবং একটিকে অপরটি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে

আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু দৃষ্টিকে যদি গভীরে লইয়া চলি, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের তর্কের ক্ষেত্র সব ডিঙ্গাইয়া পিছনে নিভৃততর চেতনার মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকি তবে দেখিব অপাত-দৃষ্টিতে যাহা 'বস্তু' ও রূপ এই দুই পৃথক জিনিষ, তাহা ক্রমে সালোক্য সামীপ্য ও সাযুজ্যের দিকে চলিয়াছে, আস্তে আস্তে পরস্পরের নিকট হইতে নিকটতর হইয়া মিলিতে চলিয়াছে; শেষে এমন এক জায়গায় পৌঁছি যেখানে উভয়ের পৃথকত্ব আর থাকে না, তাহারা হইয়া যায় অভিন্ন অখণ্ড—একমেবা-দ্বিতীয়ম্। এই যে-লোকে যে-চেতনার স্তরে জিনিষের আকার ও প্রকার, নাম ও রূপ পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের মত সম্পৃক্ত হইয়া আছে সেই লোক, সেই চেতনা হইতেই আসিতেছে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টি-প্রেরণা।

শিল্পে স্থূল মনে, মোটা অনুভূতিতে যে বস্তু আমরা চাই তাহা হইতেছে বস্তুর ত্বকমাত্র। তত্ত্ব, নীতিকথা, সদুপদেশ, আলোচনা, জিজ্ঞাসাবাদ এই সবই বস্তুর স্থূল বা উপরকার দিকে লইয়া ব্যাপৃত—এই বাহ্য। আমাদের মস্তিষ্কের, তর্কবুদ্ধির বা ব্যবহারিক জীবনের সংস্পর্শে সত্য যে ধরণের বস্তুটি লইয়া দানা বাঁধে, তাহা শিল্পীর বস্তু নয়। কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পী যে বস্তুকে বিসর্জ্জন দিয়া বসিবেন এমন কথা নাই—শিল্পীর বস্তু হইতেছে এই সকল বাহ্য খোলসের অন্তরালে রহিয়াছে, প্রত্যেক বস্তুর বা ঘটনার যে সনাতন যে অন্তরতম সত্তা, জিনিষ যেখানে শুধু "আছে", আছে আপনার আনন্দে—অস্তি ভাতি—অর্থাৎ তাহার স্বরূপে, সেখানে রূপই

জিনিষের বস্তু, কারণ তাহার বিশেষ রূপটিই তাহার সত্যকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছে। রূপ সেথানে প্রসাধন, অঙ্গসৌষ্ঠব, এমন কি, দেহমাত্র নয়—রূপ অর্থপ্রকাশ, জিনিষের প্রথম জন্মগ্রহণ। সত্তার বৈশিষ্ট্যই স্বরূপ, স্বরূপের স্বচ্ছন্দ-প্রকাশই শিল্পের রূপ। সেথানে সত্যকে গলাবাজী করিয়া কোন রকম তত্বকথা প্রচার করিতে হয় না, সেথানে সত্যের থাকিবার ঢঙ্‌ চেতনার চলিবার ভঙ্গীই হইতেছে শ্রীমান্‌ অর্থাৎ যুগপৎ সুন্দর ও কল্যাণময়।

প্রবাসী

কার্ত্তিক, ১৩৩৫

স্রষ্টা ও সমালোচক

একটা চলিত ধারণা এই যে, স্রষ্টা যিনি তিনি সমালোচক হইতে পারেন না—আর সমালোচক যিনি তাঁহারও স্রষ্টা হইবার ক্ষমতা নাই। সৃষ্টি ও সমালোচনা, দুইটি পৃথক ধরণের বৃত্তি—শুধু পৃথক নয়, পরস্পর-বিরোধী বৃত্তি; সুতরাং একই আধারে উভয়ের প্রকাশ সম্ভব নয়।

আমার কিন্তু মনে হয় সৃষ্টি ও সমালোচনার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ মিল আছে—বিরোধের অপেক্ষা সেই মিলটাই বড় সত্য। আর সাহিত্যের ইতিহাসে উভয়ের মধ্যে বিরোধের উদাহরণ অপেক্ষা মিলের উদাহরণই বেশী পাওয়া যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস।

অবশ্য একই ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি-শক্তি ও সমালোচনা-শক্তির সমান বিকাশ হামেসাই হইতেছে, এমন কথা আমি বলি না। লেওনার্দো বা গেটের মত চৌমুখী প্রতিভা খুবই বিরল, সন্দেহ

নাই। কিন্তু স্রষ্টা পুরাদস্তুর সমালোচক বা সমালোচক পুরাদস্তুর স্রষ্টা, এই রাজযোটক খুব কম দেখা গেলেও, ইহার কাছাকাছি একটা সত্য আছে, যাহার প্রমাণ বাস্তবে আমরা পদে পদে পাই, কিন্তু কখন লক্ষ্য করি না। সত্যটি এই যে, স্রষ্টারও কিছু কিছু সমালোচক হওয়া দরকার এবং সমালোচকেরও—স্রষ্টা হওয়া দরকার—স্রষ্টা হইতে হইলে স্রষ্টাকে মুখ্যত না হৌক গৌণত সমালোচক হইতে হয়, আর সমালোচক হইতে হইলেও সমালোচককে প্রকাশ্যে না হৌক গোপনে স্রষ্টা হইতে হয়।

এই শেষের কথাটা আমরা আগে বিচার করিব। সাহিত্য-মহলে সমালোচকের একটা চলিত খ্যাতি এই যে, তিনি হইতেছেন "ফেল্‌-করা" কবি—ইংরাজেরা যেমন এক সময়ে বলিতেন যে ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় ফেল-মার্কা ছেলেরাই আমাদের দেশে রাজনীতিক বিপ্লবী হইয়া উঠে, সেই রকম কবির দলও গুমর করিয়া বলিয়া থাকেন যে, যাঁহারা কবি হইতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন তাঁহারাই শেষটা সমালোচক হইয়া বসেন। কথাটা—বিপ্লবীদের সম্বন্ধে নয়, সমালোচকদের সম্বন্ধে—যে একেবারে ভিত্তিহীন বা তাহার যে কোন সদর্থ হয় না, এমন নয় কিন্তু। সৃষ্টির কাজ নিজে হাতে কলমে যে কোনদিন চেষ্টাও করে নাই, সৃষ্টির রহস্য সে বুঝিবে কি, বুঝাইবেই বা কি? আর পদে পদে যত ঠেকিয়াছি, যত বাধা বিপত্তির সাথে যুদ্ধ করিয়াছি ততই না[illegible]র ভিতরকার বিচিত্র কলকৌশল সব আমার জ্ঞানে অনুভবে [illegible]সিয়া স্পষ্ট ধরা দিয়াছে? সৃষ্টি [illegible]রিতে গিয়া যে সমালোচক[illegible]ফল হইয়াছেন,

তাই তাঁহার মত স্বয়ং কবিও হয়ত জানেন না, হৃদয়ঙ্গম করেন না সৃষ্টি জিনিষটা কি রকমের, ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়াই সমালোচকের চক্ষু আরও যেন তীক্ষ্ণ তীব্র পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির শক্তি তাঁহাতে অভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু সৃষ্টির চেষ্টার ফলে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা, যে জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাই তাঁহার সমালোচনাকে আরও বেশী পুষ্ট সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আধুনিক সমালোচনার রাজা যিনি—আজও যাঁহার প্রভাবের ও মর্য্যাদার কোন হ্রাস হয় নাই, ফরাসীর সেই সেন্ত ব্যভ (Sainte-Beuve) তাঁহার সাহিত্য-জীবন সুরু করিয়াছিলেন কাব্য ও উপন্যাস রচনার প্রয়াস দিয়া। আনাতোল ফ্রান্সের সাহিত্য সমালোচনা (La vie Litteraire) যদি এত সরস ও মূল্যবান হইয়া থাকে তবে তাহার অনেকখানি কারণ এই যে, যৌবনে তিনি কাব্যে হাত তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ম্যাথু আর্নল্ডের সমালোচনাও এমন প্রোজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী, কারণ সে সমালোচনার গোড়ায় আছে তাঁহার কবি-প্রতিভা। আর যে সকল কৃতী সমালোচকের কোন সৃষ্টি আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই, খুঁজিলে খুবই সম্ভব বাহির হইবে যে, এক সময়ে তাঁহারা সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমালোচনা বলিয়া যে জিনিষটি আমরা আধুনিক কালে বুঝি—অর্থাৎ কেবল তর্কবুদ্ধির বীক্ষণ ও বিশ্লেষণ—তাহার গোড়াপত্তন ইউরোপে করিয়া গিয়াছেন আরিস্ততল; বাল্মীকি যেমন আমাদের আদি কবি; সেই রকম আরিস্ততলকে বলা যাইতে পারে ইউরোপের "আদি সমালোচক"। এ হেন আরিস্ততল পর্য্যন্ত দেখি এক সময়ে কবিতা রচনার

চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও দারুণ বৈয়াকরণিক যে পাণিনি তিনিও একখানা মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

অন্য দিকে কবিরাও যে নির্জ্জলা কবি তাহা নহেন, প্রায়ই ত দেখি তাঁহারা আবার দক্ষ সমালোচকও বটে—হয়ত কাব্যের তুলনায় তাঁহাদের সমালোচনা খুবই ছোট জিনিষ—তবুও কোন সমালোচনা হিসাবে তাঁহাদের সমালোচনা মোটেও তুচ্ছ করিবার নয়। ইংরাজের কোলরিজ, শেলি বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ফরাসীর হিউগো বা থেওফিল গোতিয়ে, জার্ম্মানীর হায়েন বা শিলের কবিতা ছাড়া যে সমালোচনার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্যও কিছু কম নয়; আরিস্ততলের অলঙ্কার-শাস্ত্র অপেক্ষা কবি হোরাসএর (Horatius) অলঙ্কার শাস্ত্র মর্য্যাদায় নীচে স্থান পাইবে না। আমাদের দেশেও কবি রাজশেখরের “কাব্য মীমাংসা” অলঙ্কারের এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। যে সকল কবি সমালোচনা বলিয়া পৃথক কিছু রচনা করেন নাই, তাঁহারাও দেখি তাঁহাদেরই কাব্যেরই মধ্যে এখানে ওখানে নানা আলোচনার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন—নাট্য অভিনয় সম্বন্ধে সেক্স্পীয়রের ব্যাখ্যান আমাদের সকলেরই জানা আছে। ফলত কবির মধ্যে একজন সজাগ সমালোচক না থাকিলে সুন্দর সৃষ্টি কখন হয় কি না সন্দেহ—সমালোচক অর্থ রসজ্ঞ অর্থাৎ সুন্দর নির্ব্বাচন করিবার যাঁহার [illegible]ণতা আছে। স্রষ্টা কেবল একটা উত্তেজনার উন্মত্ততার তোড়ে [illegible]করিয়া চলেন, সেখানে ভাবনার [illegible]চিন্তার বিচার করিবার ও[illegible]করিবার কোন

অবসরই নাই, কেবল বেপরোয়া আবেগ—স্রষ্টার প্রকৃতি সম্বন্ধে এই রকম ধারণা বাস্তবিক কতখানি সত্য তাহা জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়। মাইকেল এঞ্জেলো হয়ত কতকটা এই ধরণের স্রষ্টা ছিলেন, এই রকম একটা আপনহারা আবেগের মধ্যে কোলরিজের "কুবলা খাঁ" রচিত হইয়াছিল—ইহা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র; কিন্তু সেই আবেগের আবেশের মধ্যেও যে একটা প্রখর সমালোচনা-বৃত্তির স্থান হইতে পারে না, এমনও কেহ বলিতে পারে না। বস্তুত যত বড় স্রষ্টা যত অনায়াসে অবহেলায় প্রচুর অজস্র সৃষ্টি করিয়া চলুন না, একটা সতর্ক দৃষ্টি, একটা সজাগ বিচার শক্তি তাঁহাদের বিপুল আবেগের সাথের সাথী। একান্ত অন্ধ অজ্ঞান অবশ অবস্থায় বৃহৎ বা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সৃষ্টি করিয়া চলা আমি সম্ভব মনে করি না।

অবশ্য সমালোচনা যদি হয় কেবল বাদ-বিচারের, শুষ্ক তর্কবৃত্তির বিলাস, তবেই তাহার সহিত সৃষ্টি-শক্তির বিরোধ ঘটিয়া যায়। নতুবা সমালোচনা যদি জড়বুদ্ধি নয় কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থাৎ প্রজ্ঞাত্মক বুদ্ধির বা বিবেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত পরিচালিত হয়, তবে এই বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। স্রষ্টা ও সমালোচকের মধ্যে যে ছেদ, যে শ্রেণীগত-দ্বন্দ্ব (class struggle) দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতেছে বিশেষভাবে আধুনিক যুগের কথা। সমালোচক ও সমালোচনা পূর্ব্ব যুগে স্রষ্টা ও সৃষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ইদানীন্তন কালে সমালোচক যতই তাহার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া আপনার পথে চলিতে সুরু করিয়াছে, কেন্দ্র হইতে প্রান্তের

দিকে আসিয়া পড়িয়াছে, ততই সৃষ্টির উৎস যে হৃদপুরুষ তাহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাই সমালোচনা এখন আর রসজ্ঞতা নয়, তাহা দর্শনের, ন্যায়-শাস্ত্রের বা ব্যাকরণের পর্য্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে। সমালোচনা মস্তিষ্কের বৃত্তি, বুদ্ধির কার্য্য—সন্দেহ নাই; কিন্তু সে মস্তিষ্ক, সে বুদ্ধি হইতেছে মস্তিষ্কের বুদ্ধির সেই অংশ যাহা হৃদপুরুষের প্রায় সংলগ্ন হইয়া আছে বা তাহার সাথে একটা সূক্ষ্ম ঐক্য-সূত্রে ছন্দিত হইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে, সমালোচনা-বৃত্তি যখন মস্তিষ্কের অতি স্থূল, উপর-উপরকার স্তরকে একান্ত আশ্রয় করিয়া চলে তখনই সৃষ্টি-শক্তির সকল খেই সে হারাইয়া বসে।

অন্যদিকে সমালোচনা-বৃত্তির এই স্বাতন্ত্র্য, এই বহির্মুখী স্থিতি আধুনিক কাব্য-রচনার উপরও একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার ধরণ-ধারণ অনেকখানি পরিবর্ত্তিত করিয়া ধরিয়াছে। প্রথমত, কবি হইয়া পড়িয়াছেন জিজ্ঞাসু, কাব্যের ঝোঁক গিয়া পড়িয়াছে তত্ত্ব-আলোচনার উপর; এবং সেই হিসাবে কবিত্বের রসায়ন হ্রাস পাইয়াছে—তাহা তরল বা ফিকে হইয়াছে—

Sicklied o'er with the pale cast of thought.

অন্যদিকে আবার কবি যেখানে সমালোচকের প্রভাব হইতে মুক্ত, সেখানে তিনি হইয়া পড়িয়াছেন নিরঙ্কুশ ভাবাবেগের দাস। অন্য কথায়, মস্তিষ্ক ও হৃদয় এই দুইটি যুগল যুগ্ম-শ[illegible] দুই দিকের বিপরীত সীমানায় আমরা চলিয়া গিয়াছি। [illegible]রের কেন্দ্রে যেখানে তাহাদের [illegible] সেখান হইতে বাহিরের প্র[illegible]শে যেখানে

তাহাদের গরমিল সেইখানটায় আশ্রয় লইতে চেষ্টা করিতেছি। সমালোচনা তাই হয় ব্যাকরণ, আর কাব্য হয় উচ্ছ্বাস নতুবা ঐ ব্যাকরণেরই আর এক রকম মূর্ত্তি।

প্রাচীনতম যুগের সকল সৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব হইতেছে সংযম, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ; তাহার মূলে ছিল হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের সম্মেলন ও সামঞ্জস্য, হৃদপুরুষের সহিত জ্ঞান-পুরুষের হরিহর মিলন।

আত্মশক্তি ১৩৩৪

সমালোচনার সার্থকতা

সৃষ্টি ও সমালোচনা এই যুগল কাজ সাধারণতঃ ভাগাভাগি করিয়া লওয়া হয়। একদল স্রষ্টা, আর একদল হইতেছে সমালোচক। সমালোচনা অর্থ সৃষ্টির ব্যাখ্যা। স্রষ্টা সৃষ্টি করিয়া গেলে, সমালোচক উঠিয়া সেই সৃষ্টির অর্থ-নির্ণয় ও স্রষ্টার স্বরূপ-পরিচয়াদি দিয়া থাকেন। সুতরাং সমালোচক যে স্রষ্টার নীচে আসন পাইবেন তাহা হয়ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু একটা কথা মাঝে মাঝে শুনা যায় যে, যিনি সৃষ্টি করিতে পারেন না তাঁহার সমালোচনায় অধিকার নাই। সিদ্ধান্তটা যে খুব ন্যায্য তাহা মনে হয় না। ধরিয়াই লইলাম সমালোচনা আর সৃষ্টি হইতেছে মানুষের দুইটী দুই[illegible]মের বৃত্তি; একটা বড় দরের, আর একটা ছোট দরের হই[illegible]ইতে পারে, কিন্তু বড়টি যদি [illegible]হারও না থাকে তবে যে [illegible] ছোটটিরও চর্চ্চা করিতে পারি[illegible] না, এমন ব্যবস্থা দিবার [illegible]ার কাহার

আছে ? আর কার্য্যতও সে ব্যবস্থার কোথাও স্থান হইয়াছে কি না সন্দেহ।

এখন প্রশ্ন—সমালোচনার উদ্দেশ্য কি, সার্থকতা কি ? একদল সমালোচকের মত এইরকম যে, তাঁহারা নিজেরা বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন না বটে ; কিন্তু তাঁহারা সৃষ্টি করেন স্রষ্টাকে। তাঁহারা ভালমন্দ দেখাইয়া দেন, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, পথঘাটের নিশানা ঠিক করিয়া এমন একটা আবহাওয়া গড়িয়া তোলেন যে, তাহার মধ্য হইতে অব্যর্থভাবে স্রষ্টার আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর কিছু না হোক অন্ততঃ সমালোচক সৃষ্টির ভুলভ্রান্তি বিপদ আপদ চিহ্নিত করিয়া দেন, সে সব দেখিয়া শুনিয়া স্রষ্টা তাঁহার সৃষ্টিকে নিখুঁৎ অনবদ্যাঙ্গ করিয়া তুলিতে পারেন। তাই দেখি না কি শিল্পকলার ইতিহাসে সমালোচনার আর সৃষ্টির যুগ পর পর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে ; বিশেষভাবে যাহা সমালোচনার যুগ তাহার পরে তাহার ফলে আসিয়াছে সুন্দরতর সৃষ্টির যুগ, সেই সৃষ্টির স্রোত স্তিমিত হইয়া গেলে আবার সমালোচনার যুগ আসিয়া নূতন আদর্শ নূতন প্রেরণা জাগাইয়াছে, আবার নবতর সৃষ্টির যুগ দেখা দিয়াছে ? সমালোচনার যে এতখানি শক্তি আমার কিন্তু তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। আমি দেখি আগে হইতেছে সৃষ্টি, পরে সমা[illegible]ণ। বাল্মীকির, হোমরের, দান্তের, সেক্সপীয়রের আগে যে খু[illegible]টা সমালোচনার হাওয়া ছিল তৎতৎ দেশে তাহার কিছুই প্রমাণ নাই। সমালোচনা আসিয়াছে ইঁহাদের পরে ইঁহাদের পা[illegible]ম অনুসরণ করিয়া। উত্তরকালে আবার যে সব সৃষ্টি

হইয়াছে তাহা যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের কল্যাণে—এইরকম সিদ্ধান্ত কাকতলীয় ন্যায় ছাড়া আর বেশী কিছু বোধ হয় না। বরঞ্চ কেহ যদি বলে সমালোচনার যুগ আসিয়া সৃষ্টির উৎসকে বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং যতদিন সমালোচনার ভার চাপিয়া থাকে ততদিন সৃষ্টি বাহির হইবার পথ পায় না; ততদিন ভিতরে ভিতরে তাহা সামর্থ্য সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে এবং সুবিধা মত নিয়ম-কানুনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া আবার তাহার জোয়ার ছুটিয়াছে—প্রমাণ যথা ফরাসী সাহিত্যে হিউগো—তবে এ কথা একেবারে ফেলিয়া দিবার মত না-ও হইতে পারে। ফলত আমি মনে করি স্রষ্টার যে সৃষ্টি-প্রেরণা তাহার মূল অনেক গভীরে, সমালোচকের কোন কথাই তাহার আসল শক্তিতে মাত্রার ন্যূনাধিক্য আনিতে পারে না। স্রষ্টার তপঃশক্তি হইতেছে যেন বিশ্বপ্রকৃতিরই একটা নিজস্ব শক্তি—ভাল-মন্দের কোন মানদণ্ড, বাদ-বিচারের কোন রকম আটঘাট অনুসারে সে চলে না, চলিতে পারে না, সে চলে নিজের মাপ নিজের পথ তৈয়ারী করিতে করিতে। The wind bloweth where it listeth—সেইরকম প্রতিভার আবেগ কোন্‌দিকে কি ভাবে চলিবে তাহার ঠিক ঠিকানা কিছুই নাই। জার্ম্মানীর বুকে গ্যেটের আবির্ভাব দেখিয়া আমাদের এক কবি বলিয়াছেন—

A perfect face amid barbaria[illegible]es.

আবার এই চি[illegible]র বিপরীত চিত্র পাই য[illegible] দেখি আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থ[illegible] আমেরিকার ভিতর হইতে[illegible]আদিম প্রকৃতির

কেমন একটা অসংস্কৃত প্রাণ লইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান্।

সমালোচনা-বৃত্তির সহিত সৃজন-বৃত্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, যদি কিছু সম্বন্ধ থাকে তাহা হইতেছে গৌণ সম্বন্ধ। সমালোচনা-বৃত্তি সৃজন-বৃত্তিকে বাড়াইতে পারে না, এমন কি কমাইতেও পারে কিনা সন্দেহ; তবে তাহা সৃষ্টির উপকরণাদি জোটাইয়া দিতে পারে, স্রষ্টার সম্মুখে নানা রকমের ক্ষেত্র, নূতন ধরণের বিষয় সব আনিয়া ধরিতে পারে। প্রাচীনতর শিল্পীরা আধুনিকতর শিল্পী অপেক্ষা দৃষ্টির গভীরতা, প্রেরণার শক্তি, রচনার সামর্থ্যের হিসাবে অর্থাৎ কেবলমাত্র কবিত্বের হিসাবে কোন অংশে হীন নহেন, বরং মনে হয় তাঁহারাই এই দিক দিয়া গরীয়ান ও মহীয়ান। কিন্তু আধুনিকেরা প্রাচীনদের ছাড়াইয়া গিয়াছেন বৈচিত্র্যের, সূক্ষ্মতার দিক দিয়া। আধুনিকের সৃষ্টি এত রকমারি, এত জটিল, এত বিপুল যে হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে ইদানীন্তন কালের সমালোচনা—কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, গবেষণা, বিচার। এই হিসাবে সমালোচনা স্রষ্টার সহায় হইয়াছে—স্রষ্টার মূল শক্তিকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই, কিন্তু স্রষ্টার ক্ষেত্রকে তাহা প্রসারিত বহুল বিচিত্র করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু আম্‌া। বোধ হয় সমালোচনার যে আসল সার্থকতা তাহা স্রষ্টার সটা নয়, তাহা হইতেছে সাধারণের সম্পর্কে আর ছোট ছোট বাইগরদিগের সম্পর্কে। সুন্দর জিনিষকে চেনা, উপভোগ করা তুসরা সহজেই পারে না। সে জাবাপ্রয়োজন একটা

শিক্ষাদীক্ষা, একটা কালচার (culture) বা সংস্কৃতি। সাধারণের রুচি যাহাতে মার্জ্জিত হইয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে যথার্থ রসজ্ঞতা যাহাতে জন্মিতে পারে সেই কাজই সমালোচনার। সমাজের মধ্যে এই রকম সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির,গুণগ্রাহিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা, প্রসার করা, একটা অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠ লোকমত গড়িয়া তোলাই সমালোচনার সার্থকতা। সমস্ত সমাজ তাহাতে পায় একটা উচ্চতর সুন্দরতর মানস জীবনের ধারা। সমাজের মধ্যে রসজ্ঞতা, শিল্পবোধ যেখানে সহজ সুলভ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির গোড়াকার তত্ত্ব বা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিধানগুলি যেখানে সাধারণের জ্ঞানে অনুভবে সজাগ, সেখানে কোন শিল্পীই একেবারে মারাত্মক রসভঙ্গ করিয়া বসেন না, এমন একটা আদর্শ সেখানে সহজ প্রতিষ্ঠা পায়, যাহার নীচে কোন শিল্পীই নামিয়া পড়িতে পারেন না। অবশ্য অবতারকল্প স্রষ্টা-পুরুষ যাঁহারা তাঁহাদের কথা আলাদা—তাঁহারা নিজেরাই রসের সৌন্দর্য্যের নূতন ব্যাকরণ গড়িয়া তোলেন, কিন্তু সে রকম শক্তি যাঁহাদের নাই তাঁহাদের জন্য একটা মানদণ্ড, একটা রীতি বা ধারা স্থাপন করিয়া দিয়া সমালোচনা কলা-লক্ষ্মীকে অনেক লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি দিতে পারে।

ইংরাজী ও ফরাসী শিল্পসৃষ্টির ধারা তুলনা করিলে কথাটা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। জাতিহিসাবে ইংরাজের [illegible] শিল্প-অনুভূতি তেমন প্রসার লাভ করে নাই। সেখানে স্রষ্টা[illegible] [illegible]হারা, তাঁহারা সাধারণ হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন [illegible]হাদের হইতেছে ব্যক্তিগত সৃষ্টি। [illegible]াধারণের মধ্যে সেখানে শিল্প[illegible] [illegible]দ একটা গড়িয়া

[illegible]। চর্চ্চা, আলোচনা, সমালোচনা—শিক্ষা সাধনার অভাবে [illegible]খানকার শিল্প-সৃষ্টি কেমন অসম, খামখেয়ালী ; খুব উঁচুদরের শিল্পীর সাথে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর শিল্পী স্থান পাইয়াছে, এমন কি একই শিল্পীর মধ্যে খুব ভাল মন্দ—সুন্দর ও অসুন্দর জিনিষ মাখামাখি হইয়া আছে। কিন্তু ফরাসীর মধ্যে শিল্পসাধনা একটা জাতিগত ধর্ম্ম, একটা সামাজিক গুণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের ফরাসী শিল্পী সমান স্তরের ইংরাজ শিল্পী হইতে সুন্দরতর সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। ফলত দেখি মোটের উপর ফরাসী দেশে যাঁহারাই কলম ধরিতে পারিয়াছেন তাঁহারা চেষ্টা করিলেও নেহাৎ বাজে জিনিষ রচনা করিতে পারেন নাই। একটা সমবেত সাধনার চেষ্টা ফরাসী সাহিত্যের এমন একটা ঢং, এমন একটা কাঠাম, এমন একটা আদর্শ দিয়া ফেলিয়াছে যে, সাহিত্যিক মাত্রেই যেন বিনা আয়াসে তাহা অনুসরণ করিয়া চলে। আর এটি যে একটা বিস্তৃত সমালোচনার ফলে হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাহিত্য-চর্চ্চা, শিল্প-সমালোচনা ফরাসীরা যে কেবল গ্রন্থ লিখিয়া করিয়াছে তাহা নয়—এ দিক দিয়া তাহারা অবশ্য যথেষ্টই করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের শিল্প-চর্চ্চার আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্র হইতেছে সভা, সমিতি, সম্মিলন—'সালোঁ', 'অ্যাকাদেমী' (Salon, Academie)। এই সকল কেন্দ্রে ভাবের [illegible] তার আদান-প্রদানে, তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিচার, অনুসন্ধান, গ[illegible] প্রভৃতির কল্যাণে একটা সজীব শিল্প-জীবন ফুটিয়া উঠিয়াছে [illegible] সারা ফরাসী দেশের উপর ছ[ড়া]ইয়া পড়িয়াছে।

সমালোচনার সার্থকতা

আমাদের দেশে, ইংরাজের আওতায় থাকিয়া আমরাও কতকটা ইংরাজি ধরণের হইয়া গিয়াছি। একটা সমষ্টিগত সাহিত্য বা শিল্প-জীবন আমাদের সাধারণের ত' গড়িয়া উঠেই নাই, এমন-কি শিল্পীদের মধ্যেও তাহা হয় নাই। আমাদের গুণীরা সকলেই ছাড়া ছাড়া আপনার ভাবে আপনি চলিয়াছেন। তাই আমাদের শিল্প-সৃষ্টি ভাল-মন্দ সুন্দর-কুৎসিত জিনিষের অপূর্ব্ব মিশ্রণ হইয়া উঠিয়াছে। তাই অবনীন্দ্রনাথের সহিত এক নিঃশ্বাসে রবিবর্ম্মার নাম করিতে আমাদের কোন রকম সঙ্কোচ হয় না। আমাদের পুস্তকাগারে দেখি রবীন্দ্রনাথ ও 'বটতলা' বেশ পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া আছে। একটা সমালোচনার হাওয়া কিছুদিন হইল দিয়াছে বটে, কিন্তু সমালোচনা অর্থ আমরা এখনও অনেকখানি বুঝি ব্যক্তিগত খেয়ালের উদ্গার—অকারণ অকিঞ্চিৎকর নিন্দা-স্তুতির সমারোহ। সমালোচনা কেবলমাত্র দোষের, এমন-কি দোষগুণেরও হিসাব নয়। সৌন্দর্য্য রচনার বিধিব্যবস্থা বা শাস্ত্র নিবদ্ধ করাও সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য নয়। যথার্থ সমালোচনা তাহাকে বলি যাহা এই সকল উপায় ধরিয়া রসকে উদ্ধার আবিষ্কার করিতে পারে, যাহা সাধারণের অনুভূতিকে, সৃষ্টিকে সংস্কৃত মার্জ্জিত শাণিত করিয়া তাহাদের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে পারে সত্যকার সৌন্দর্য্যবোধ, রসজ্ঞতা, গুণগ্রাহিতা।

বিজলী ১৩৩১

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

সাহিত্যিকা—১৸৹ রূপ ও রস—১৸৹

মৃতের কথোপকথন—১৷৹

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ইরাণী উপকথা—১৷৹ উড়ো চিঠি—১৸৹

শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত

অরবিন্দের পত্র—৷৵৹ মা (নূতন বই)—৸৹

পণ্ডিচারীর পত্র—৵৹ কর্ম্মযোগী—২৲

আর্য্য পাবলিশিং হাউস

৬[illegible] [illegible]লেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যাইতে পারে। কিন্তু গণোরিয়ার দ্বারা যে বাত হয় তাহাতে মাছ মাংস, দুধ এবং শরীরের উত্তেজক পদার্থ খাওয়া যাইতে পারে।

চর্ম্মরোগ :—চর্ম্মরোগে সহজ-পরিপাচ্য খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। যাহা সহজে পরিপাক হয় না তাহা খাওয়া নিষেধ। সকল রকমের ফ্যাট্ অম্ল, আচার, দাহকারী মসলা, ও অত্যন্ত লবনাক্ত পদার্থ বর্জ্জনীয়। দুধ পরিপাক না হইলে ছানার জল দেওয়া যাইতে পারে। যাহাতে বুকের দাহ উৎপাদন করে এরূপ খাদ্য খাওয়া নিষেধ। আম, কাটাল ইত্যাদি খাওয়া উচিত। কাল জাম, কমলা লেবু দেওয়া যাইতে পারে।

সমাপ্ত।